

Through knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah - IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও আমাদের জীবন

তত্ত্বাবধানে

জমা দিয়েছেন:

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা - আইওএম

ত্বলিবের নাম: শরিফুল ইসলাম

রোল: ২৩০৯০১১০১৪৭

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা - আইওএম

তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও আমাদের জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের
একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শরিফুল ইসলাম

রোলঃ 23090110147

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “কুরআন ও আমাদের জীবন” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শরিফুল ইসলাম, আইডিঃ ২৩০৯০১১০১৪৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম: মাওলানা মাহবুবুর রহমান

ডিপার্টমেন্ট: দাওয়াহ

প্রতিষ্ঠান: ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “কুরআন ও আমাদের জীবন” শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

	(স্বাক্ষর)
তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৫	ত্বলিবের নাম: শরিফুল ইসলাম
	রোল: ২৩০৯০১১০১৪৭
	ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
	ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	৬
কুরআনের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৬
কেন এই বিষয়টি বেছে নেওয়া হয়েছে	৬
কুরআন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা	৭
মূল আলোচনা / অধ্যায়সমূহ.....	১০
কুরআনের পরিচয়	১০
আভিধানিক পরিচয়:.....	১০
পারিভাষিক পরিচয়:	১১
কুরআন আল্লাহর কালাম	১১
কোরআন নাযিলের ইতিহাস	১৩
কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণ	১৫
কুরআন হিদায়াতের মাধ্যম.....	২১
কুরআনের মাধ্যমে হেদায়াত লাভের উপায়	২১
হেদায়াত লাভের জন্য কতিপয় গুণ অর্জন করা	২২
কুরআন সকল রোগের শিফা, কুরআনি রুকইয়া	২৫
ইতিহাসে মুসলিমদের অবস্থা	২৭
বর্তমান সমাজে কুরআন অবহেলা/কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিণতি	২৮
কোরআন পরিত্যাগের অর্থ.....	৩০
কোরআন পরিত্যাগের নানা দিক	৩০
কোরআন পরিত্যাগকারীর প্রতি হুঁশিয়ারি	৩১
সমাধান ও করণীয়	৩২
কুরআন তিলাওয়াত, হিফজ ও তাদাব্বুর	৩৩
কুরআন তিলাওয়াত.....	৩৩
হিফজ	৩৫

তাদাব্বুর	৩৬
শিক্ষাব্যবস্থায় কুরআন	৪০
ইসলামি শিক্ষার উদ্দেশ্য.....	৪১
ইসলামি শিক্ষানীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য	৪৩
জীবনধারায় কুরআনকে বাস্তবায়ন	৪৬
ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের বাস্তবায়ন.....	৪৮
পারিবারিক জীবনে কুরআনের বাস্তবায়ন	৭০
পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা	৭১
স্বামী স্ত্রী হিসেবে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব.....	৭৪
স্বামীর ওপর স্ত্রীর হকসমূহ.....	৭৪
স্ত্রীর ওপর স্বামীর হকসমূহ	৭৭
পিতা-মাতা হিসেবে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭৯
সামাজিক জীবনে কুরআনের বাস্তবায়ন.....	৮৮
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কুরআনের বাস্তবায়ন.....	৮৯
অর্থ-সম্পদ উপার্জনের মৌলিক ও স্বীকৃত পন্থা.....	৯০
কৃষি খাত.....	৯০
ব্যবসা.....	৯০
শ্রম.....	৯১
শিল্প	৯১
সম্পদ অর্জনের নিষিদ্ধ পন্থা.....	৯৪
রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআনের বাস্তবায়ন.....	৯৭
আইন বিভাগ	৯৭
নির্বাহী বিভাগ	৯৭
বিচার বিভাগ	৯৯
মানব রচিত আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী.....	১০০
উপসংহার	১০১
তথ্যসূত্র.....	১০২

ভূমিকা

কুরআনের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

কুরআন মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযীলকৃত এক ঐশী গ্রন্থ, যা বিশ্ববাসীর জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি শুধু একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং এটি জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের মৌলিক বিধান, নীতি ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে এবং ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির পথ দেখায়। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য নিয়মিত কোরআনের তেলাওয়াত, অর্থ অনুধাবন, এবং তদানুযায়ী ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে কোরআনের হুকুম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা আবশ্যিক।

কেন এই বিষয়টি বেছে নেওয়া হয়েছে

মানুষ মাত্রই চায় সফল হতে। আর জীবনে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। কুরআন ও আমাদের বিষয়টি গবেষণার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন সৌভাগ্যের পথ দেখায়। এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা কুরআনের গভীর অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারব এবং এর নির্দেশনাগুলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারব, যা আমাদের সুন্দর ও উন্নত জীবন গঠনে সহায়ক হবে এবং দুনিয়ার সফলতা ও আখেরাতের মুক্তির উপায় হবে। ইসলামে চিন্তা ও গবেষণা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করাকে সর্বোত্তম চিন্তা এমনকি ইবাদত হিসাবেও গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের প্রায় একশত আয়াতে মহান আল্লাহ চিন্তার ইবাদতে করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করতে পার।”
(সূরা বাকারা, আয়াত ২১৯)।

কুরআন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী শরীয়তের চারটি উৎসের মধ্যে কুরআনই হচ্ছে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস। ইসলামী শরীয়তের বিধান পালনের জন্য কোরআন শেখা ফরজ। যেমন বিশুদ্ধ নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোরআন তিলাওয়াত শুদ্ধ হওয়া আবশ্যিক। তাই তিলাওয়াত শুদ্ধ করা ফরজ। ইবাদতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়—এমন জ্ঞানের ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হলো তা অর্জন করা ফরজে কেফায়া। ইসলাম ধর্মে গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন ধরনের গবেষণার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কালামে পাকের অমোঘ ঘোষণা

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ

“নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং দিবা-রাত্রির আবর্তনের মধ্যে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ সব কিছু তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সব পবিত্রতা একমাত্র তোমারই। আমাদের তুমি দোষখের শাস্তি হতে বাঁচাও।” (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৯০-১৯১)

কোরআন গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নের কতিপয় পয়েন্টে আলোচনা করা হলো:

• পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বোঝা

কুরআন মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কুরআনের বিধান, আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে জানতে ও জীবনে প্রয়োগ করতে হলে এর গভীর উপলব্ধির জন্য গবেষণা অপরিহার্য।

• সমস্যার সমাধান ও সঠিক পথনির্দেশ

গবেষণা একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। কুরআন নিয়ে গবেষণা করে আমরা জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারি এবং সঠিক পথে চালিত হতে পারি।

• আধ্যাত্মিক ও মানবিক উন্নয়ন এবং জাগতিক কল্যাণ

গবেষণা মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় ক্ষেত্রেই কল্যাণ লাভে সহায়তা করে। এটি মানুষকে আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে শেখায়। কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষণা হৃদয়কে পরিষ্কার করে এবং একজন ভালো মানুষ ও মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রতি আরও বেশি আস্থাশীল হয়।

- জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয়

কুরআন গবেষণা ও চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে। ইসলামে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম, তবে তা অবশ্যই কুরআনের নির্দেশনা ও যুক্তির ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

- জীবনযাত্রার উন্নয়ন

কুরআন শুধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থই নয়, এটি জীবনযাত্রার পদ্ধতিও শেখায়। যেমন, কুরআন পাঠ ও অধ্যয়ন অনেককে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে, ভাষার উন্নয়ন ঘটাতে এবং তাদের কাজ ও পারিবারিক জীবন পরিচালনার পদ্ধতিকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে।

মানুষের জীবনে কুরআনের প্রভাব কেন গবেষণার উপযুক্ত বিষয়

মানবিক ও ধর্মীয় দিক থেকে কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অফুরন্ত। মহান আল্লাহ তাআলা কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও চর্চা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

“এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমানরা যেন তা অনুধাবন করে।” (সূরা সোয়াদ, আয়াত ২৯)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। পাশাপাশি সে যুগের প্রেক্ষাপট সামনে নিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যাও বলে দিতেন। তিনি নিজে কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। সাহাবিদেরও কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহিত করেছেন। আউফ বিন মালিক (রা.) বলেন, একবার আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে অবস্থান করলাম। তিনি মিসওয়াক করলেন। অতঃপর অজু করে নামাজে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর সঙ্গে দাঁড়লাম। তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত শুরু করলেন। রহমত ও দয়া বিষয়ক কোনো আয়াত এলে তিনি থামতেন এবং তা কামনা করতেন। আবার শাস্তিবিষয়ক কোনো আয়াত এলে তখনো তিনি থামতেন এবং তা থেকে মুক্তি চাইতেন। (নাসায়ি, হাদিস ১১৩৫)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবিরা কোরআনের নির্দেশনাকেই অগ্রগণ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তা বাস্তবায়নে আয়াতে কোরআন ভালোভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করতেন। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, ‘আমাদের মাঝে যখন কেউ ১০টি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলো অতিক্রম করতেন না।’^১

সাহাবিরা কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ফজিলত ও মর্যাদা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা কোরআনকেই সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কোরআনের একটি আয়াত পুনরাবৃত্তি করতে করতে পুরো রাত কাটিয়ে দিতেন। ইবনে আব্বাস (রা.) চিন্তা-ভাবনা ছাড়া সুরা বাকারা পাঠের চেয়ে মনোযোগ সহকারে সুরা জিলজাল ও আল-কারিয়া তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন। (সুনানুন নাসায়ি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৩)

আবদল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেছেন, ‘যে জ্ঞান অন্বেষণ করতে চায়, সে যেন আল-কোরআনকে প্রাধান্য দেয়। কেননা এর মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব জ্ঞানই নিহিত আছে।’^২

যারা কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেন এবং কোরআনের আয়াত শুনে বিগলিত হয়ে যান তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রকৃত মুমিন ও জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, বলো, ‘তোমরা কোরআনে বিশ্বাস করো কিংবা বিশ্বাস না করো, ইতোপূর্বে যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের যখন কোরআন পাঠ করে শোনানো হয়, তখন তারা নতমস্তকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।’ আর তারা বলে, ‘আমাদের রব মহান পবিত্র; আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা কাঁদতে কাঁদতে নতমস্তকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আর তা তাদের বিনয় ও নম্রতা বাড়িয়ে দেয়।’ (সুরা আল-ইসরা, আয়াত ১০৭-১০৯)

কোরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা, ভাবনা ও গভীর মনোনিবেশ বান্দার জন্য ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য নিয়ে আনে। এর মাধ্যমে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়। ঈমান বৃদ্ধি পায়। ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে থাকে। অন্তরে দুনিয়ার বাস্তবতা ফুটে ওঠে। হৃদয় কোমল হয়। আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মুমিন তো তারাই, আল্লাহর কথা আলোচিত হলেই যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের রবের ওপর নির্ভর করে।’ (সুরা আনফাল, আয়াত ২)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোনো একটি গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সঙ্গে মিলে (কোরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন তাদের ওপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তাআলা তার নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। (মুসলিম, হাদিস ২৬৯৯)

কুরআনের পরিচয়

আভিধানিক পরিচয়:

আল-কুরআন (الْقُرْآن) শব্দটি (قُرْأَ কিংবা قُرْأَ) “কারউন” শব্দ থেকে উৎপন্ন।। এর অর্থ একত্র করা, জমা করা। الْقُرْآن শব্দটি قُرْأَ (পড়া) শব্দ থেকে আসলে قُرْآن শব্দের অর্থ হয় অধিক পঠিত, আর قُرْآن (মিলিত থাকা) শব্দ থেকে আসলে قُرْآن শব্দের অর্থ হয়; পরিপূর্ণভাবে মিলিত ও সংযুক্ত। যেহেতু কুরআন মাজিদ সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ এবং এর আয়াত অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে পরিপূর্ণ মিল রয়েছে, তাই এর নাম الْقُرْآن।

আল্লামা যারকানী বলেন- কুরআন শব্দটি “ قُرَاءَة ” (কারা'আতুন) ধাতু হতে এসেছে যার অর্থ অধ্যয়ন করা ও পাঠ করা।

কুরআন অবতরণকালে আরবের অবিশ্বাসীরা এ কুরআনের পবিত্র বানী শুনতে চাইতো না। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তারা নানারূপ হট্টগোল করত, যাতে কুরআনের বাণী তাদের কানে না পৌঁছে এবং বুঝতে না পারে। এ হীন আচরণের জবাবে আল-কুরআন (পঠিত গ্রন্থ) নাম রেখে বুঝানো হয়েছে- তোমরা যতই কুৎসিত আচরণ দ্বারা কুরআনের বাণীকে ঠেকাতে চাও, কিন্তু কিছুতেই তা পারবে না। পবিত্র এ কিতাব পঠিত হওয়ার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হতেই থাকবে। বস্তুত আজ পর্যন্ত সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত সত্য হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র কুরআনই সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী 'কুরআন' শব্দের এ নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন, “আসমানী গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কিতাবকেই কুরআন বলা হয়েছে এ জন্য যে, আসলে এ কিতাবেই অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। সে সব গ্রন্থের শিক্ষা ও সারসংক্ষেপ এ পবিত্র গ্রন্থে আছে। মূলত বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইলম-বিদ্যারও সমাবেশ ঘটেছে এ কিতাবে।

পারিভাষিক পরিচয়:

মহান আল্লাহ জাঙ্গা শানহুর পক্ষ থেকে মানবজাতির হেদায়াতের ও মুক্তির জন্য জিবরাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাঃ এর নবুওয়াতের দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে যে কিতাব নাজিল হয়েছে তার সমষ্টি আল কুরআন।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, “আল-কুরআন মহান আল্লাহর সেই অতীব পবিত্র ও সম্মানিত কলাম যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে। আর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌছেছে। আর 'তা হল কুরআনের আয়াত ও এর অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম।”

আল-কুরআনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আল্লামা নাসাফী (র) বলেন, “মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে, আর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।” (আল-মানার: নাসাফী)

কুরআন আল্লাহর কলাম

কুরআনের ব্যাপারে মুসলমানদের সরল আকিদা হল, কুরআন আল্লাহর কলাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ
“মুশরিকদের কেউ আপনার কাছে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিবেন। যাতে সে আল্লাহর কলাম শুনতে পায়। এরপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবেন। কারণ, তারা জানে না।” (সূরা তাওবা, আয়াত ৬)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ

“তারা চায় আল্লাহর কলামকে পরিবর্তন করে দিতে।” (সূরা ফাতহ, আয়াত ১৫)

এ ধরনের আরও অসংখ্য আয়াত রয়েছে যেখানে কুরআনকে আল্লাহর কলাম বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা এবং তাবিয়িনদের যুগে কুরআন নিয়ে আকিদা কেন্দ্রিক কোন বিতর্ক

ছিল না। তাদের সরল আকিদা ছিল, কুরআন আল্লাহর কালাম। কিন্তু অন্যান্য সভ্যতা এবং মতাদর্শের সঙ্গে বিশেষ করে গ্রীক মতাদর্শের সঙ্গে মুসলমানরা যখন পরিচিত হল, তখন কেউ কেউ কুরআন আল্লাহর কালাম এটা অস্বীকার করে। তারা বলতে বলতে থাকে কুরআন হলো মাখলুক তথা সৃষ্ট! জাদ ইবনে দিরহাম, জাহম ইবনে সাফওয়ান সহ কেউ কেউ এ মতাদর্শ প্রচার করেন। হকপন্থি আলেমগণ শক্তভাবে তাদের খণ্ডন করেন।

হিজরি তৃতীয় শতকে মুতাজিলাদের দ্বারা এ ফিতনা নতুন করে হাওয়া পায়। মুতাজিলা তাদের ভ্রান্ত আকিদার পক্ষে আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনকে পেয়ে যায়। হকপন্থি আলেমরা তাদের প্রতিবাদ করতেন, তাদের বক্তব্য খণ্ডন করতেন। খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হলো হকপন্থি আলেমদের কণ্ঠরোধ করা। জেল, জুলুমের দিকেও গড়ায় ব্যাপারটি। ইতিহাসে সে সময়টাকে ‘মিহনায়ে খলকে কুরআন’ বলা স্মরণ করা হয়। খলিফা মামুন, মুতাসিম এরা বিদায় নিলে ধীরে ধীরে সে ফিতনার আগুন নিভে যায়। ১৪ শত বছরের উম্মাহর অকাট্য আকিদা হলো, কুরআন আল্লাহর কালাম, মাখলুক নয়।

ইমাম তাহাবি রাহি. কুরআন সংক্রান্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখে,

وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، وَأَيَّقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ، فَمَنْ سَمِعَهُ فَرَّغَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ، وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرٍ،

অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহ থেকে বাণী হিসাবে কোন ধরনের অবস্থা ও আকৃতি ছাড়া এর প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহ তাআলা ওহি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। মুমিনগণ হিসাবে কুরআনকে সত্যায়ন করে নিয়েছে। তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে, প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহর কালাম। এটি সৃষ্টির কথার মতো সৃষ্ট নয়। সুতরাং কেউ এ কালাম শুন্যার পর যদি ধারণা করে, এটি মানুষের কথা, সে কাফের। আল্লাহ তাআলা এ ধরনের লোকদের নিন্দা করেছেন, তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং জাহান্নামের ধমক দিয়েছেন।^৩

কুরআন আল্লাহর কালাম। কালাম আল্লাহর সিফাত তথা গুণ। আল্লাহর সিফাত তাঁর সৃষ্টি হতে পারে না। সিফাত সৃষ্টি হলে তাঁরও সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ সৃষ্টি নয়, বরং তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। এ কারণে ইমাম তাহাবি রাহি. বলেন, সুতরাং কেউ এ কালাম শুন্যার পর যদি ধারণা করে, এটি মানুষের কথা, সে কাফের।

কোরআন নাযিলের ইতিহাস

কোরআন নাজিল হয়েছে সারা বিশ্বের সব মানুষের জন্য। এটা কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের তাবৎ মানুষের পথনির্দেশ। পবিত্র আল কোরআন- মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির দিগদর্শণ, মুসলিম উম্মাহর জন্য শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত।

বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত মহানবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহর কাছ থেকে সময়ে সময়ে হজরত জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতা মারফত এটি অবতীর্ণ হয়। কোরআন নাজিলের সূচনা ৬১০ সালে। পবিত্র মাহে রমজানের শবে কদরে নাজিল শুরু হয়েছিল আল-কোরআন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, ‘রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে আল-কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।’ (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৮৫)

পবিত্র কোরআন নাজিলের ছয় মাস আগে থেকেই আল্লাহ তায়ালা তার হাবিব হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নের মাধ্যমে এ মহান কাজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। মহান আল্লাহপাক ফেরেশতা হজরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক মহানবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পবিত্র হেরা গুহায় কোরআন শরীফ নাজিল করেছিলেন। সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হল সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত^৪

(১) ‘পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’

(২) ‘সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে’

(৩) ‘পড় এবং তোমার প্রভু বড়ই দয়ালু’

(৪) ‘যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দান করেছেন’

(৫) ‘তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।

আর সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত হল- সূরা বাক্বারাহর সর্বশেষ ২৮১ নং আয়াত- ‘আর তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন তোমরা পুনরায় ফিরে যাবে আল্লাহর কাছে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মফল পুরোপুরি পাবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।’^৫

জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়বস্তু নিয়ে নাজিল হয়েছে খণ্ডে খণ্ডে, দীর্ঘ ২৩ বছরে। কোরআন পরিপূর্ণ রূপ পায় ৬৩২ সালে। কোরআনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াতগুলোই বদলে দেয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের জীবন আবর্তিত হয় আল্লাহর কালাম এই কোরআনকে ঘিরেই। তাই কোরআনের প্রতিটি আয়াত বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণে প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না।

কোরআনের আয়াতাংশ, আয়াত, সূরা-যখনই যা নাজিল হতো, তখনই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজে বার বার তেলাওয়াত করতেন এবং উপস্থিত সাথীদের শোনাতে। সাহাবীরা তা বার বার তেলাওয়াত করে মুখস্থ করে ফেলতেন। আর কাতিব অর্থাৎ লিপিকররা তা লিপিবদ্ধ করতেন। বিভিন্ন পর্যায়ে ৪০-এর অধিক সাহাবী কোরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবিরা খেজুর গাছের ছাল, পাথর, চামড়া, কাগজ ও হাড়ের ওপর কোরআন লিপিবদ্ধ করতেন। এরপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে জমা করতেন।

ওহি লেখক হিসেবে সাহাবীদের ভেতর খ্যাতিমান ছিলেন জায়েদ বিন সাবিত (রা.), আলী ইবনে আবি তালেব (রা.), উবাই বিন কাব, উসমান বিন আফফান (রা.), জোবায়ের ইবনুল আওয়াম প্রমুখ। এ ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম, মুগিরা বনি শোবা, মুআইকিব বিন আবি ফাতিমা, হানজালা বিন রাবি, শুরাহবিল ইবনে হাসনাহ, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লেখক হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন।

কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণ

নাজিলের সূচনা থেকেই মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাহাবীরা মুখস্থ করা ও লেখার মাধ্যমে কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের কাজ শুরু করেন। কোরআন লিখে রাখার কাজে মোটা কাগজ, চামড়া, পাথরখণ্ড, জস্তুর হাড় ও খেজুর পাতা ব্যবহার করা হয়। আলী ইবনে আবু তালিব, উবাই ইবনে কাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জায়েদ বিন সাবিত (রা) কোরআন লিপিবদ্ধকারী হিসেবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। জায়েদ বিন সাবিতকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনে বসেই কোরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কোনো আয়াত নাজিল হলেই তিনি তাকে ডেকে নিয়ে তেলাওয়াত করে শোনাতে। আয়াতটি কোন সূরার কোন আয়াতের আগে বা পরে কোথায় বসাতে হবে, সে-সম্পর্কে নির্দেশনা দিতেন। জায়েদ সেভাবে লিপিবদ্ধ করে শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্যে তা আবার নবীজীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে শোনাতে। এভাবে পুরো কোরআন সূরা আকারে বিন্যস্ত, লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ করার নির্ভুল প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশাতেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর কোরআন চর্চা নতুন গতি লাভ করে। মসজিদে নববী সংলগ্ন চত্বরে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের এক বিশাল দল কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই পুরো কোরআন মুখস্থ করেছেন এমন হাফেজের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। আর জায়েদ বিন সাবিত, আলী ইবনে আবু তালিব, উসমান ইবনে আফফান, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কাব, সাঈদ ইবনুল আস, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর, আনাস ইবনে মালেক, আবদুর রহমান ইবনে হারিস, মুয়াজ ইবনে জাবল, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবদুর রহমান ইবনে শিহাব, আবু আইয়ুব আনসারী (রা) প্রমুখসহ ৬৫ জন সাহাবীর কাছে কোরআনের সব সূরা লিখিত আকারে ছিল। অর্থাৎ পুরো কোরআনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সূরা আকারে বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ অবস্থায় ছিল; শুধু একত্রে ‘মসহাফ’ আকারে গ্রন্থিত হয় নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরই আরবের বিভিন্ন এলাকায় ভণ্ড নবীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। এদের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে বহু হাফেজ শহিদ হন। তখন হযরত ওমরের (রা) পরামর্শ ও অনুরোধে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) পবিত্র কোরআনকে একত্রে গ্রন্থাকারে সংকলনের উদ্যোগ নেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ কাতিব জায়েদ বিন সাবিত (রা) কে প্রধান করে হযরত আবু বকর (রা) একটি টিমকে এ-কাজের দায়িত্ব দেন।

খলিফা ফরমান জারি করেন যে, যার কাছে কোরআনের যে অংশ লিখিত আছে, তা জায়েদ (রা) এর কাছে হাজির করতে হবে। জায়েদ (রা) একইসাথে হাফেজ ও কাতিব ছিলেন। তিনি শুধু নিজের স্মৃতি ও লেখার ওপর নির্ভর করেন নি। তিনি তার কাছে লিখিত প্রতিটি আয়াতের সমর্থনে দুজন করে কাতিবের লেখার সাথে তা মিলিয়েছেন এবং সেই কাতিব যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এই আয়াত লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সপক্ষে দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। একইসাথে সেই আয়াত দুজন হাফেজ একইভাবে মুখস্থ করেছেন কিনা এবং তিনি যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সেই আয়াত শুনে মুখস্থ করেছেন, তার সপক্ষে দুজন সাক্ষী তলব করেছেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরকম নির্ভুলভাবে আল্লাহর কালামকে পেশ করেছেন, সংকলনের ক্ষেত্রেও সাহাবীরা ছিলেন একইরকম আন্তরিক ও সত্যনিষ্ঠ। গ্রন্থাকারে সংকলন যাতে নির্ভুল হয়, সেজন্যে তারা সর্বকম সতর্কতাই গ্রহণ করেছিলেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ কোরআন আর জায়েদ বিন সাবিত (রা) এর নেতৃত্বে সংকলিত এই মসহাফের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কাগজ, চামড়া, পাথর, খেজুর পাতা—যা পাওয়া গেছে তাতেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে আর মসহাফে একই সাইজের কাগজে লিপিবদ্ধ করে একটার পর একটা কাগজ সাজিয়ে ওপরে-নিচে শক্ত মলাট দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে। শক্ত মলাট দিয়ে বাঁধাই করার কারণেই এর নামকরণ হয়েছে ‘মসহাফ’। মসহাফ তৈরি হওয়ার পর সাহাবীরা সর্বসম্মতভাবে একে সঠিক বলে সত্যায়িত করেন এবং হযরত আবু বকর (রা) এর কাছে সংরক্ষণের জন্যে পেশ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানায় তা সংরক্ষণ করেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের একবছরের মধ্যেই পুরো কোরআন একত্রে গ্রন্থাকারে সংকলনের এই কাজ সম্পন্ন হয়। হযরত আবু বকর (রা) এর পর হযরত ওমর (রা) এই মসহাফ সংরক্ষণ করেন। তাঁর সময় খেলাফতের সীমানা পারস্য থেকে লিবিয়া এবং আরব সাগর থেকে আজারবাইজান পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। তিনি এই বিশাল অঞ্চলে অভিন্ন উচ্চারণ ও বাক-রীতিতে পবিত্র কোরআন পঠনপাঠনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পুরো কার্যক্রম তদারকির জন্যে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবু মুসা আশয়ারী (রা), মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) সহ ১০ জন বিশিষ্ট সাহাবীকে খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। হযরত ওমর (রা) এর মৃত্যুর পর এই মসহাফ তাঁর কন্যা ও উম্মুল মোমেনিন হযরত হাফসা (রা) এর হেফাজতে সংরক্ষিত হয়।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) এর সময় খেলাফতের আরো বিস্তৃতি ঘটে। তিনি সব অঞ্চলে অভিন্ন পঠনপাঠনরীতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কোরআনের কপি করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হযরত হাফসা (রা) এর কাছে সংরক্ষিত মসহাফ চেয়ে পাঠান। তিনি কোরাইশদের পঠন ও লিখনরীতি অনুসারে মসহাফের কপি করার জন্যে প্রধান কাতিব জায়েদ বিন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর, সাঈদ ইবনুল আস, আবদুর রহমান ইবনে হারিস, উবাই ইবনে কাব সহ ১২ জন সাহাবীর একটি টিম গঠন করেন। তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্ভুলভাবে এই মসহাফের কপি করেন। হযরত উসমান (রা) একটি কপি নিজের কাছে এবং একটি মদিনার মহাফেজখানায় রেখে অবশিষ্ট কপিগুলো সত্যাযন করে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের কাছে প্রেরণ করেন। আর মূল কপি ফেরত পাঠান হযরত হাফসা (রা) এর কাছে।

হযরত উসমান (রা) এর সময় কপি করা হয়েছিল বলে ইতিহাসে এ মসহাফ পরিচিতি লাভ করে ‘মসহাফে উসমানী’ নামে। মসহাফে উসমানী-র সত্যায়িত একটি কপি এখনো সংরক্ষিত আছে মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তানের তাসখন্দ মিউজিয়ামে। দামেস্কে প্রেরিত মসহাফের অবিকল প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে তুরস্কে ইস্তাম্বুলের টপকাপি মিউজিয়ামে ও যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে। হরিণের চামড়ায় তৈরি কাগজে এই মসহাফের প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে মিশরের দারুল কুতুব সুলতানিয়ায়।

মসহাফে উসমানী বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হওয়ার পর প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোরআন কপি করার প্রচলন শুরু হয়। শতাব্দী পরিক্রমায় কোরআনের হাজার হাজার কপি সর্বত্র প্রচার লাভ করে। ইসলামের ইতিহাসের সকল যুগের কপি করা কোরআনের পাণ্ডুলিপির বিশাল সংগ্রহ রয়েছে ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, আয়ারল্যান্ডের চেস্টার বিয়াটি মিউজিয়াম ও ইংল্যান্ডের লন্ডন মিউজিয়ামে। এসব পাণ্ডুলিপির সাথে তাসখন্দ মিউজিয়াম, ইস্তাম্বুলের টপকাপি মিউজিয়াম ও মিশরে কায়রোর আল-হোসেন মসজিদে সংরক্ষিত মসহাফ মিলিয়ে দেখা গেছে যে, মূল মসহাফের লিখনের সাথে এগুলোর কোথাও কোনো অমিল নেই।

জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের The Institute for Koranforschung হাতে লেখা ৪২ হাজার কপি পূর্ণ বা আংশিক কোরআন সংগ্রহ করে। দীর্ঘ ৫০ বছর গবেষণা করার পর ইনস্টিটিউট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পাণ্ডুলিপি পাঠে কোনো পার্থক্য নেই। দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমাবর্ষণে ইনস্টিটিউটটি ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহর অনুগ্রহ আর সাহাবীদের আন্তরিক ও বস্তুনিষ্ঠ প্রয়াসের ফলে নাজিল হওয়ার সময় যেভাবে পঠিত হয়েছে, ১৪ শত বছর ধরে সারা পৃথিবীর ঘরে ঘরে এই একই কোরআন সেভাবেই পঠিত হচ্ছে। কোরআন একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যা তার মূল ভাষাকে ধরে রেখেছে এবং মূল ভাষাতেই পঠিত ও চর্চিত হচ্ছে। সেই একই কোরআন। ১১৪ টি সূরা। ৬,২৩৬ টি আয়াত।

কালের বিবর্তনে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কোরআনের লেখ্যরূপ বিবর্তিত হয়েছে। মসহাফে উসমানী লেখায় নোকতা, জের, জবর, পেশ ইত্যাদির কোনো ব্যবহার ছিল না। সাধারণ আরবি লেখায় এখনো ওপরে বা নিচে বর্ণ পার্থক্যকারী কোনো চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। আরবরা শব্দের গঠন দেখেই বর্ণের উচ্চারণ করে। আর বাক্যের গঠন দেখেই আরবরা হ্রস্ব-স্বর উচ্চারণে পার্থক্য করে নেয়। হযরত ওমরের (রা) সময় খেলাফত অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) এর সময় খেলাফত আরো ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। বর্ণ ও পাঠসহায়ক চিহ্ন ছাড়া কোরআন পাঠে ভবিষ্যতে তারা ব্যাপক ভুলত্রুটির শিকার হতে পারে, এই আশঙ্কা দেখা দেয়। হযরত আলী (রা) বিশিষ্ট ভাষাবিদ আবুল আসাদ দোয়েলীকে বিষয়টি সুরাহা করার দায়িত্ব দেন। তিনি মসহাফে উসমানী-তে তাশকিল অর্থাৎ পাঠসহায়ক জের, জবর, পেশ ব্যবহার করেন। বর্ণপরিচায়ক নোকতা ব্যক্তিগত মসহাফে প্রথম ব্যবহার করেন হযরত হাসান আল বসরী ও আল্লামা ইবনে শিরিন। আবুল আসাদ দোয়েলী ও তার ছাত্র নসর ইবনে আসিম ও ইয়াহিয়া ইবনে আমর ৫০ হিজরিতে কোরআন লেখায় ‘বর্ণপরিচায়ক’ নোকতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মসহাফে ব্যবহার করেন। ৬০ হিজরিতে খলিফা আবদুল মালেকের নির্দেশে সকল মসহাফে বাধ্যতামূলকভাবে নোকতা ও তাশকিল প্রয়োগের কাজ সুসম্পন্ন হয়।

কোরআনের প্রাথমিক কপি মসহাফে উসমানী-তে কোনো সূরার আগে সূরার নাম লেখা হয় নি। রেখা টেনে বা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমকে আলাদা করে ওপরের লাইনে লিখে এক সূরা থেকে আরেক সূরাকে পৃথক করা হয় নি। আয়াতগুলোও কোনো চিহ্ন বা সংখ্যা দিয়ে আলাদা করা হয় নি। ধারাবাহিকভাবে একের পর এক লিখে যাওয়া হয়েছে। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে সূরার ওপর সূরার নাম এবং ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ ওপরের লাইনে আলাদা লেখার এবং দুই আয়াতের মাঝে চিহ্ন বা সংখ্যা দেয়ার পদ্ধতি চালু হয়।

হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে প্রতিদিন সমপরিমাণ তেলাওয়াত করে সাত দিনে পাঠ সম্পন্ন বা খতম করার সুবিধার জন্যে কোরআনকে ‘সাত মনজিলে’ ভাগ করা হয়। প্রতিবার তেলাওয়াতের হিসাব রাখার সুবিধার্থে হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ্বে কোরআনকে ৫৫৮ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের নাম দেয়া হয় রুকু। ৩০ দিনে কোরআন খতম করার সুবিধার্থে কোরআনকে ৩০ পারায় ভাগ করা হয় হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে। আর হাজার বছর ধরে কোরআনের এই লিখিত রূপই চালু রয়েছে সারা বিশ্বে।

কোরআনের আয়াতমালা অবিকৃত ও বিশুদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখেছে একে মুখস্থ রাখার সহজাত আগ্রহ। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন হচ্ছে কোরআনের শিক্ষার প্রতিচ্ছবি। আর কোরআন নাজিল হয়েছে ২৩ বছর সময় নিয়ে। তিনি শুধু কোরআন শিক্ষাই দেন নি। পুরো কোরআন তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁকে অনুসরণ করে কোরআন মুখস্থ করতে সাহাবীদের আগ্রহের কোনো অভাব ছিল না। হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন আমর, হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা, হযরত উম্মে সালমা (রা) প্রত্যেকেই হাফেজ ছিলেন। পুরো কোরআন তাঁদের মুখস্থ ছিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় মদিনাতেই হাফেজের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যায়।

সাহাবী, তাবেরী, তাবে তাবেরীদের জীবন আবর্তিত হয়েছে কোরআনকে ঘিরে। তারা কোরআন মুখস্থ করেছেন, কোরআনের জ্ঞানে নিজেরা জ্ঞানী হয়েছেন এবং অন্যকে কোরআনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে। আর দিনে পাঁচ বার কোরআনের মুখস্থ করা অংশ থেকে তেলাওয়াত করা তো নামাজ কায়েমের জন্যে বাধ্যতামূলক। আবার রাতে দীর্ঘসময় নামাজে দীর্ঘ সূরা পাঠ পরিণত হয় অনেকের দৈনন্দিন অভ্যাসে। সেই যুগে এমন কোনো শিক্ষিত পরিবার ছিল না, যেখানে অন্তত একজন হাফেজ ছিলেন না।

কালের বিবর্তনে কোরআন মুখস্থ করা শিক্ষার একটি অংশে পরিণত হয়। হাজার হাজার হিফজখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোরআন নাজিলের ১৪ শত বছর পরও কোরআন মুখস্থকারীর সংখ্যা কোনোভাবেই হ্রাস পায় নি, বরং বেড়েছে। মুসলমানদের এমন কোনো পাড়া বা মহল্লা নেই, যেখানে আরব-অনারব, কালো-সাদা, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ কেউ না কেউ কোরআন মুখস্থ পারেন না। এই হিফজ শিক্ষার শুরু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তাঁর মাধ্যমে শিখেছেন সাহাবীরা। আর তাঁদের সত্যায়িত প্রক্রিয়াতেই এখনো প্রতি বছর হিফজ করছেন হাজার হাজার হাফেজ।

দুনিয়ায় অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে— তাওরাত, জিন্দাবেস্তা, উপনিষদ, বেদ, বাইবেল, গীতা, ধর্মপদ। আছে অনেক সেক্যুলার গ্রন্থ—দর্শন, কাব্য, উপন্যাস। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, এই গ্রন্থ ও রচনাবলির কতটা কতজন মুখস্থ বলতে পারবেন? খোঁজ করলে কদাচিৎ দুই-একজনকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কিন্তু কোরআন মুখস্থকারীর সংখ্যা সংখ্যা হবে লক্ষ লক্ষ। আর এই লক্ষ লক্ষ হাফেজের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কোরআন এবং মসহাফে উসমানী থেকে কপি করা মুদ্রিত কোটি কোটি কোরআন একই কোরআন। সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধতায় কোরআন এ-ক্ষেত্রে অনন্য।

এই বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক তথ্যই প্রমাণ করে কোরআনে প্রদত্ত আল্লাহর অঙ্গীকারের সত্যতা,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“নিশ্চয়ই আমি এই কোরআন (ধাপে ধাপে) নাজিল করেছি এবং (সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে) আমি একে রক্ষণাবেক্ষণ করব।” (সূরা হিজর, আয়াত ৯)

কুরআন হিদায়াতের মাধ্যম

কুরআন হলো মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত প্রধান হেদায়াত বা পথপ্রদর্শকের উৎস। এটি নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং জীবনের সকল বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে এবং অন্তরে শান্তি এনে দেয়। কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করলে মানুষের জ্ঞান বিকশিত হয় এবং তারা সুপথ লাভ করে।

কোরআন মাজিদ শুরুতেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছে,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

“এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২)

কুরআনের মাধ্যমে হেদায়াত লাভের উপায়

কুরআনের মাধ্যমে হেদায়াত লাভের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যেতে পারে:

অধ্যয়ন ও অনুধাবন: কুরআনের আয়াতগুলোর অর্থ, ভাব ও মর্ম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

নিয়মিত তেলাওয়াত: নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়নের মাধ্যমে হেদায়াতের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

কুরআনভিত্তিক আমল: কুরআনের শিক্ষা ও নির্দেশনার ভিত্তিতে নিজেদের জীবনযাপন ও আমল করা জরুরি।

সুন্নাহের অনুসরণ: কুরআনের নির্দেশনার পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও তাঁর জীবনযাপন অনুসরণ করাও হেদায়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

হেদায়াত লাভের জন্য দুআ করা: হেদায়াত লাভের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো আল্লাহর নিকট আন্তরিকতার সাথে দুআ করা। কেননা দু’ আর মাধ্যমে হেদায়াত লাভের বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। হেদায়াত লাভের জন্য দুআ করা আল্লাহ তায়ালাই আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন’ যা আমরা সালাতের প্রত্যেক রাকাতেই পড়ি,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

“আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।” (সূরা ফাতিহা, আয়াত ৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এই দোয়া শিখিয়েছেন

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

“হে আমাদের রব! আপনি হেদায়েত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বাঁকা করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন।” (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৮)

কুরআনের হিদায়াত লাভ করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা করতে হবে এবং তারপর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাব যে দুআ করতেন “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং স্বাবলম্বীতা প্রার্থনা করছি।” (মুসলিম-২০১) নবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিমধ্যেই আল্লাহ তা'আলার দ্বারা পরিচালিত এবং সুরক্ষিত ছিলেন, তবুও তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে হেদায়েতের জন্য দোয়া করতেন এবং সেই হেদায়েত রক্ষা করতেন।

হেদায়াত লাভের জন্য কতিপয় গুণ অর্জন করা

পবিত্র কুরআন একেবারে একটি হিদায়াত ও পথ নির্দেশনার গ্রন্থ। কিন্তু এর থেকে লাভবান হতে চাইলে মানুষের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক গুণ থাকতে হবে। হেদায়াত লাভের জন্য সর্বপ্রথম যে গুণটির প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, আমাদেরকে “মুক্তাকী বা তাকওয়াবান” হতে হবে। তাকওয়ার অর্থ আল্লাহর ভয়ে পাপ থেকে বিরত থাকা। আমাদের মধ্যে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা, মন্দ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ও ভালোকে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা এবং এ আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা থাকতে হবে। তবে যারা দুনিয়ায় পশুর মতো জীবন-যাপন করে, নিজেদের কৃতকর্ম সঠিক কি না সে ব্যাপারে কখনো চিন্তা করে না, যদিকে সবাই চলছে বা যদিকে প্রবৃত্তি তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অথবা যদিকে মন চায় সেদিকে চলতে যারা অভ্যস্ত, তাদের জন্য কুরআন মজীদে কোন পথ নির্দেশনা নেই।

হিদায়াত তাদের জন্য যারা তাকওয়া করে। কিন্তু কুরআনে অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যে হিদায়াত সকলের জন্য। এখন যদি এটা সকলের জন্য হয় তাহলে কেন বলা হচ্ছে যে এটা মুতাক্কীনের জন্য? এখানে আমাদের হিদায়াতের অর্থ পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

কুরআন থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হবার জন্য হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত গায়বের প্রতি ঈমান আনা। ‘গায়েব’ বা অদৃশ্য বলতে এমন গভীর সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত এবং কখনো সরাসরি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতা, অহী, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। এ গভীর সত্যগুলোকে না দেখে মেনে নেয়া এবং নবী এগুলোর খবর দিয়েছেন বলে তাঁর খবরের সত্যতার প্রতি আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে ‘ঈমান বিল গায়েব’ বা অদৃশ্যে বিশ্বাস। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি অনুভব করা যায় না এমন সত্যগুলো মেনে নিতে প্রস্তুত হবে, একমাত্র সে-ই কুরআনের হিদায়াত ও পথ নির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি মেনে নেয়ার জন্য দেখার, ঘ্রাণ নেয়ার ও আস্বাদন করার শর্ত আরোপ করে এবং যে ব্যক্তি বলে, আমি এমন কোন জিনিস মেনে নিতে পারি না যা পরিমাণ করা ও ওজন করা যায় না—সে এ কিতাব থেকে হিদায়াত ও পথ নির্দেশনা লাভ করতে পারবে না।

কুরআন থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হবার জন্য হচ্ছে তৃতীয় শর্ত হচ্ছে নামায কায়েম করা। এর অর্থ হচ্ছে, যারা কেবল আল্লাহ মেনে নিয়ে নীরবে বসে থাকবে তারা কুরআন থেকে উপকৃত হতে পারবে না। বরং মেনে নেয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই তার আনুগত্য করা ও তাকে কার্যকর করাই হচ্ছে এ থেকে উপকৃত হবার জন্য একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন। আর বাস্তব আনুগত্যের প্রধান ও স্থায়ী আলামত হচ্ছে নামায। ঈমান আনার পর কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হতে না হতেই মুয়াযযিন নামাযের জন্য আহবান জানায় আর ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি বাস্তবে আনুগত্য করতে প্রস্তুত কি না তার ফায়সালা তখনই হয়ে যায়। এ মুয়াযযিন আবার প্রতিদিন পাঁচ বার আহবান জানাতে থাকে। যখনই এ ব্যক্তি তার আহবানে সাড়া না দেয় তখনই প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি এবার আনুগত্য থেকে বের হয়ে এসেছে। কাজেই নামায ত্যাগ করা আসলে আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করারই নামান্তর। বলা বাহুল্য কোন ব্যক্তি যখন কারোর নির্দেশ মেনে চলতে প্রস্তুত থাকে না তখন তাকে নির্দেশ দেয়া আর না দেয়া সমান।

নামায কায়েম করা একটি ব্যাপক ও পূর্ণ অর্থবোধক পরিভাষা যা অবশ্যি জেনে রাখা প্রয়োজন। এর অর্থ কেবল নিয়মিত নামায পড়া নয় বরং সামষ্টিকভাবে নামাযের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করাও এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত। নামাজ কায়েম/প্রতিষ্ঠা দুই ধরনের হতে পারে : এক, ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠা, দুই, সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা।

কুরআনের হিদায়াত লাভ করার জন্য চতুর্থ শর্ত হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে খরচ করা। সংকীর্ণমনা ও অর্থলোলুপ না হয়ে মানুষকে হতে হবে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়কারী। তার সম্পদে আল্লাহ ও বান্দার যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, তাকে তা আদায় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যে বিষয়ের ওপর সে ঈমান এনেছে তার জন্য অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করার ব্যাপারে সে কোন রকম ইতস্তত করতে পারবে না।

কুরআনের হিদায়াত লাভ করার জন্য পঞ্চম শর্ত হচ্ছে পবিত্র কুরআন এবং এর আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সে সবগুলোর ওপর ঈমান আনা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে যেসব কিতাব নাযিল করেছিলেন সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। এ শর্তটির কারণে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিধান অবতরণের প্রয়োজনীয়তাকে আদতে স্বীকারই করে না অথবা প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও এজন্য অহী ও নবুওয়াতের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না এবং এর পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া মতবাদকে আল্লাহর বিধান বলে ঘোষণা করে অথবা আল্লাহর কিতাবের স্বীকৃতি দিলেও কেবলমাত্র সেই কিতাবটি বা কিতাবগুলোর ওপর ঈমান আনে যেগুলোকে তাদের বাপ-দাদারা মেনে আসছে আর এ উৎস থেকে উৎসারিত অন্যান্য বিধানগুলোকে অস্বীকার করে -তাদের সবার জন্য কুরআনের হিদায়াতের দুয়ার

রুদ্ধ। এ ধরনের সমস্ত লোককে আলাদা করে দিয়ে কুরআন তার অনুগ্রহ একমাত্র তাদের ওপর বর্ষণ করে, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী মনে করে এবং আল্লাহর এ বিধান আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে না এসে বরং নবীদের ও আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমেই মানুষের কাছে আসে বলে স্বীকার করে আর এই সঙ্গে বংশ, গোত্র বা জাতি প্রীতিতে লিপ্ত হয় না বরং নির্ভেজাল সত্যের পূজারী হয়, সত্য যেখানে যে আকৃতিতে আবির্ভূত হোক না কেন তারা তার সামনে মস্তক অবনত করে দেয়।

কুরআনের হিদায়াত লাভ করার জন্য পঞ্চম শর্ত হচ্ছে ষষ্ঠ শর্ত হচ্ছে “আখেরাতের ওপর একীন/ বিশ্বাস রাখে।” আখেরাত একটি ব্যাপক ও পরিপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ। আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টির ভিত্তিতে এ আখেরাতের ভাবধারা গড়ে উঠেছে। বিশ্বাসের নিম্নোক্ত উপাদানগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

- ১) এ দুনিয়ায় মানুষ কোন দায়িত্বহীন জীব নয়। বরং নিজের সমস্ত কাজের জন্য তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।
- ২) দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা চিরন্তন নয়। এক সময় এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং সে সময়টা একমাত্র আল্লাহই জানেন।
- ৩) এ দুনিয়া শেষ হবার পর আল্লাহ আর একটি দুনিয়া তৈরি করবেন। সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের জন্ম হয়েছে সবাইকে সেখানে একই সঙ্গে পুনর্বীর সৃষ্টি করবেন। সবাইকে একত্র করে তাদের কর্মকাণ্ডের হিসেব নেবেন। সবাইকে তার কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন।
- ৪) আল্লাহর এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংলোকেরা জান্নাতে স্থান পাবে এবং অসংলোকদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।
- ৫) বর্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি, সাফল্য ও ব্যর্থতার আসল মানদণ্ড নয়। বরং আল্লাহর শেষ বিচারে যে ব্যক্তি উত্তরে যাবে সে-ই হচ্ছে সফলকাম আর সেখানে যে উত্তরোবে না, সে ব্যর্থ। এ সমগ্র আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে যারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, তারা কুরআন থেকে কোনক্রমেই উপকৃত হতে পারবে না। কারণ এ বিষয়গুলো অস্বীকার করা তো দূরের কথা এগুলো সম্পর্কে কারো মনে যদি সামান্যতম দ্বিধা ও সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে মানুষের জীবনের জন্য কুরআন যে পথনির্দেশ করেছে সে পথে তারা চলতে পারবে না।

কুরআন সকল রোগের শিফা, কুরআনি রুকইয়া

কুরআন মানুষের কল্যাণে নাজিল হয়েছে। মানুষের জীবনে এমন কিছু নেই যা কুরআনের আলোচনায় আসেনি। এ কুরআনে এমন কিছু আয়াত আছে যেগুলো বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির জন্য শিফা স্বরূপ। তাই এ সব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে রোগ থেকে মুক্তি চাওয়া উচিৎ। রোগ থেকে মুক্তি লাভের পূর্ব শর্ত হচ্ছে আল্লাহর উপর পূর্ণ একিন (আস্থা এবং বিশ্বাস) রাখা, আল্লাহর বিধানকে জানা এবং যথাযথ মানার পাশাপাশি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া।

কুরআনুল কারীম যে রোগের শিফা তা আল্লাহ তাআলা কুরআনেই বলেছেন, “আর অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়। (সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত ৮২)। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ফরমান, “হে মানব জাতি, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।” (সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৭)

কুরআন রোগের শেফা সম্পর্কে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তায়ালা এমন কোনও রোগ সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক তিনি সৃষ্টি করেননি।’ (বুখারী, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৮৪৮, হাদীস নং-৫২৭৬; তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড-১০ম, পৃষ্ঠা-২৩৫)

হযরত আব্দুল মালিক ইবনে ওমায়ের রহ. বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সূরা ফাতিহার মধ্যে সমস্ত রোগ হতে শেফা (আরোগ্য) রয়েছে।^৬

কোরআন শরিফের মাঝে এমন কিছু আয়াত আছে যেগুলো বিভিন্ন রোগ-বিমারের জন্য শিফা স্বরূপ। তাই কোরআনের সেসব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালায় কাছে শিফা বা রোগ মুক্তি চাওয়া উচিৎ। আল্লাহর উপর পূর্ণ একিন নিয়ে এবং দুআ কবুল হবে এমন বিশ্বাস নিয়ে দুআ করলেই কেবল এসব আয়াতের দ্বারা রোগমুক্তি লাভকরা সম্ভব হবে।

রোগ-ব্যাধি থেকে শিফা লাভে কয়েকটি আয়াত

পবিত্র কুরআনে কারীমের ৬ টি আয়াত আয়াতে শেফা বা রোগ মুক্তির আয়াত নামে পরিচিত। এগুলো পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়ে নেয়া উত্তম।

শিফার আয়াত-১

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

এবং আল্লাহ মু'মিনদের (মুসলমানদের) অন্তরসমূহ শান্ত করে দেন। (সূরা তাওবা, আয়াত ১৪)

শিফার আয়াত-২

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। (সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৭)

শিফার আয়াত-৩

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। (সূরা নাহল, আয়াত ৬৯)

শিফার আয়াত-৪

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮২)

শিফার আয়াত-৫

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

এবং যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন (সূরা শুআরা, আয়াত ৮০)

শিফার আয়াত-৬

قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার (সূরা হা-মীম, আয়াত ৪৪)

ইতিহাসে মুসলিমদের অবস্থা

পৃথিবীর আবহমানকালের ইতিহাসের ভেতর শির উঁচু করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের গৌরবের অতীত; গর্বময় ঐতিহ্য। ইতিহাস সাক্ষী দেয় একসময় মুসলমানরা অর্ধেক পৃথিবী (Half of the known world) শাসন করেছে, এবং জ্ঞান বিজ্ঞান, ন্যায় বিচারে সবার জন্য একটা রোল মডেল ছিল। ঐ সময়ে তারা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিল, বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের সবার সমঅধিকার, অন্য ধর্ম, মতের প্রতি শ্রদ্ধা সবই ছিল, যেখানে তখন ইউরোপ সহ অন্য দেশ গুলি কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল।

মানুষ মুসলমানদের কাছে জ্ঞান বিজ্ঞান শিখতে আসত, আজকে যেমন মুসলমানরা অন্যদের কাছে শিখতে যায়। এই ইহুদীদের স্বর্ণযুগ ছিল মুসলমানদেরই শাসনামলে। স্পেনে মুসলিম শাসনকালে ইহুদীরা সবচেয়ে ভাল ছিল-এটাও ঐতিহাসিক সত্য।

আমরা মুসলমানদের যুদ্ধের ইতিহাসে আলো ফেললে দেখতে পাই, রণক্ষেত্রে তাদের ইস্পাতকঠিন চিন্তা, নিপুণ কৌশল, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, নব্য আবিষ্কৃত অস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম কতোটা সর্বজনবিদিত।

তারপর সব কিছু বদলে যেতে লাগল। মুসলিমরা আস্তে আস্তে কুরআন ছেড়ে দেওয়া শুরু করল, দুনিয়ার চাকচিক্য আর ভোগ নিলাসে মত্ত হয়ে পড়ল, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আর কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল। এর ফলে আস্তে আস্তে মুসলমানরা তাদের গৌরব হারাতে লাগল, সেই সাথে সম্রাজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ওসমানীয় সম্রাজ্যের পতন, ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন দখল, ১৯৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধে পরাজিত এই সবই মুসলিম জাতির নিকট অতীতের পরাজয়ের ইতিহাস। এর সাথে আছে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলির চরম খারাপ অবস্থা। সবখানেই জ্বালাও পোড়াও চলছে। মুসলমানদের অধঃপতন আর পরাজয়ের মূল কারণ কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়া।

বর্তমান সমাজে কুরআন অবহেলা/কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিণতি

পুরো মুসলিম উম্মাহ আজ ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অন্তর্জাতিকভাবে যেখানেই অধপতন ও আত্মসানের শিকার, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর মূলে হলো পবিত্র কুরআন থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়া। সময় যত গড়াচ্ছে কুরআন থেকে আমাদের দূরত্ব ততোই বাড়ছে। কুরআন না আছে আমাদের সকালের তেলাওয়াতে, না আছে সারাদিনের ব্যস্ততায়। না আছে আমাদের পারিবারিক শাসনে, না আছে সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনে। কুরআন নেই আমাদের চেতনায়, নেই আমাদের দিনরাতের ভাবনায়। কুরআনের ভেতরে আমরা খুঁজি না আগামী দিনের প্রেরণা, কুরআন নিয়ে নেই আমাদের কোনো তাড়না। কুরআন নেই আমাদের জীবন সমস্যা সমাধানে, নেই উম্মাহর রাষ্ট্রীয় সংবিধানে। মহাগ্রন্থ নেই আমাদের বিচারে, নেই কুরআনের বাহকদের প্রচারে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সর্বক্ষেত্রে আমরা সর্বগ্রাসী অধপতনের শিকার হয়েছি।

কবি আব্বাস ইকবাল তাঁর এক কবিতায় যথার্থই লিখেছেন, “ওহ যামানা মে মুআযযায থী হামেলে কুরআন হো কর/ আওর তুম খার হুয়ী তারেকে কুরআন হো কর”

অর্থাৎ ইসলামের প্রথম যুগের মানুষ সম্মানিত ছিলেন কুরআনের বাহক হয়ে, আর তোমরা অপদস্থ হচ্ছে কুরআন ছেড়ে দিয়ে।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ যেসব ক্ষেত্রে অধপতনের শিকার তার মধ্যে অন্যতম হলো নৈতিক অধপতন, বিজাতীয় সংস্কৃতি লালন, ধর্মহীন শিক্ষাগ্রহণ, নাস্তিকতা পালন, স্বৈরশাসকদের তোষণ, দুর্বল ও প্রতিবেশির প্রতি অবহেলা, নিজের স্বকীয়তা ভুলে যাওয়া, নববী আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়া, সত্যের পথে মানুষকে না ডাকা, অন্যায় থেকে বিরত না রাখা, অন্যের অধিকারের ব্যাপারে বেপরোয়া মানসিকতা, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, বেপর্দা, ইসলামী খেলাফতের প্রতি অনীহা, উপনৈবেশিক শক্তির চাটুকারিতা, নিজ মাতৃভূমি অন্যের হাতে তুলে দেয়া, নিজ ভূমিতে অন্যকে দখল করে থাকতে দেয়া, প্রতিরোধশক্তি হারিয়ে ফেলা, ইসলামের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধব্যবস্থা অপাত্রে ব্যবহার করা ইত্যাদি। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ সমস্যাগুলোর প্রতিষেধক পবিত্র কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে কুরআনের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা আছে। কিন্তু আমরা তো কুরআন থেকে দূরে, বহু দূরে!

যে পবিত্র কুরআন আমাদের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সংবিধান সেই কুরআন আজ সংকুচিত হতে হতে নামাযের তেলাওয়াত, তাবিজ-কবজ এবং ইসালে সাওয়াবের খতমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। কোনো সমস্যায় আক্রান্ত হলে আমরা মসজিদ-মাদরাসায় গিয়ে কুরআনের একটি কপি হাদিয়া দিয়ে আসি, অথচ একবারও ভাবি না, এই কুরআন খুললেই আমি আমার সমস্যার সামাধান পেয়ে যেতাম! কারণ মহান আল্লাহ তাআলা তো মানবজাতির যাবতীয় সমস্যা ও প্রয়োজন খুলে খুলে বর্ণনা করার জন্যই কুরআন নাজিল করেছেন। কুরআনে জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে। আগে-পরের যতকিছু আছে তার সবই আছে কুরআনে। (সূরা নাহল, আয়াত ৮৯; সূরা আনআম, আয়াত ৫৯; সূরা নামল, আয়াত ৭৫; তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৭১৪)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.)-কে একলোক বলেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। উত্তরে তিনি বলেন, ‘তুমি আল্লাহর কিতাবকে রাহবার হিসেবে গ্রহণ কর। কুরআনকে তোমার বিচারক বানাও। কারণ এটাই সেই বস্তু যা তোমাদের রাসূল তোমাদের জন্য রেখে গেছেন। কুরআন তোমার জন্য সুপারিশকারী। কুরআন তোমার জন্য অনুসরণীয়। কুরআন এমন এক সাক্ষী যার সাক্ষ্য নিয়ে কারও কোনো আপত্তি থাকবে না। এতে তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের আলোচনা আছে। তোমাদের জীবনের যাবতীয় বিষয়ের সমাধান আছে। এখন যা হচ্ছে এবং সামনে যা হবে তার সবই কুরআনে আছে।’^৭

কোরআনচর্চায় অনীহা এবং কোরআন থেকে দূরে থাকার পরিণতি ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন ‘আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ১২৪)

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। তার একটি হলো আল্লাহর কিতাব। তাতে আছে হিদায়াত ও আলো, যে এটাকে আঁকড়ে রাখবে সে হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যে এটা ছেড়ে দেবে সে পথ হারিয়ে ফেলবে।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস ৬১১৯)

কোরআন পরিত্যাগের অর্থ

কোরআন পরিত্যাগের অর্থ হলো কোরআনের নির্দেশাবলী উপেক্ষা করা এবং এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এর মধ্যে কোরআন না শোনা বা এর প্রতি মনোযোগ না দেওয়া, কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল না করা, হালাল-হারামকে উপেক্ষা করা এবং শাসনব্যবস্থায় কোরআনের বিধান না মানা অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, কোরআন নিয়ে গভীর চিন্তা ও বুঝ থেকে বিরত থাকা এবং কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করা পরিত্যাগ করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে অনুযোগ করে বলেছেন, “হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় তো এই কোরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।” (সূরা ফোরকান, আয়াত ৩০)

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) লেখেন, ‘মক্কার কুরাইশরা কোরআন তিলাওয়াতের সময় শোরগোল ও হৈচৈ করত এবং তা শ্রবণ করত না—এটা কোরআন পরিত্যাগ। কোরআনের ওপর আমল ছেড়ে দেওয়া এবং তা মুখস্থ না করাও কোরআন পরিত্যাগ।

কোরআনের প্রতি ঈমান ত্যাগ করা, তা সত্যায়ন না করা, কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করা, কোরআনের আদেশ ও নিষেধ অনুসরণ না করাও কোরআন পরিত্যাগ করা। কোরআনের পরিবর্তে কবিতা, গদ্য, গান, হাসি-কৌতুক, গালগল্প ইত্যাদির প্রতি ঝুঁকে যাওয়াও কোরআন পরিত্যাগ।’ (তাফসিরে ইবনে কাসির)

কোরআন পরিত্যাগের নানা দিক

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম ৰাওজি (রহ.) বলেন, কোরআন পরিত্যাগের নানা দিক আছে। তা হলো—

১. কোরআন শ্রবণ ও তার প্রতি ঈমান পরিত্যাগ করা।
২. কোরআনের হালাল ও হারাম সংক্রান্ত বিধানগুলো জানা ও তার ওপর আমল পরিহার করা।
যদিও ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করে এবং তার প্রতি বিশ্বাস রাখে।
৩. কোরআনকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ না করা এবং কোরআনের বিধানগুলোকে অর্থহীন মনে করা।
৪. কোরআন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা ত্যাগ করা।
৫. আত্মার রোগের প্রতিকারে কোরআনি চিকিৎসা পরিত্যাগ করা।

সমাজের বহু মানুষ কোরআনচর্চাকে রমজান মাসের ভেতর সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। তারা রমজান মাসে এক খতম বা দুই খতম কোরআন তিলাওয়াত করেন। কিন্তু সারা বছর কোরআন স্পর্শ করে দেখেন না। এটা কোরআন পরিত্যাগ করার নামান্তর।

কোরআন পরিত্যাগকারীর প্রতি হুঁশিয়ারি

কোরআনের একাধিক আয়াতে কোরআন পরিত্যাগকারীর প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআন থেকে দূরে সরে যায় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে পথভ্রষ্টতার চোরাবালিতে আটকে যায়। শয়তানের খেলনায় পরিণত হয়। আর শয়তান তাকে ধ্বংস ও অপমানের দিকে নিয়ে যায়। ফলে এ ধরনের মানুষ দুনিয়ার জীবনে পেরেশানি এবং আখেরাতে বঞ্চনার শিকার হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى.

“যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব।” (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ১২৪)

অন্যত্র বলেন—

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهُتَدُونَ.

“যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির থেকে অন্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, যে তার সঙ্গী হয়ে যায়। তারা (শয়তান) তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে আর তারা মনে করে— আমরা সঠিক পথেই আছি।” (সূরা যুখরুফ, আয়াত ৩৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۚ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۖ خَلِيدِينَ فِيهِ ۚ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۖ

“আমি আমার কাছ থেকে তোমাকে দান করেছি উপদেশ। যে এটা (কোরআন) থেকে বিমুখ হবে সে কিয়ামতের দিন মহাভার বহন করবে। তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য হবে কত মন্দ।” (সূরা তাহা, আয়াত, ৯৯-১০১)

সমাধান ও করণীয়

মুসলিম উম্মাহ পবিত্র কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার মাধ্যমেই অধপতনের শিকার হয়েছে, সুতরাং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কুরআনের কাছে ফিরে আসার মাধ্যমেই হবে। যে জাতিকে আল্লাহ তাআলা কুরআন দিয়ে সম্মানিত করেছেন সে জাতি যদি কুরআন থেকে দূরে সরে অন্য কোথাও নিজেদের সম্মান খোঁজে তবে আল্লাহ তাদেরকে পদে পদে লাঞ্চিত করবেন, এটাই স্বাভাবিক। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনেছেন তারা যদি কুরআন ছেড়ে আবার অন্ধকারে ফিরে যায় অথবা ভিন্নপথে আলো খোঁজে তবে তাদের কপালে অধপতনের কলঙ্কতিলক সুনিশ্চিত। পবিত্র কুরআনকে আমাদের চরিত্রের মধ্যে গেঁথে নিতে পারলেই এ সমস্যা থেকে আমাদের উত্তরণ সম্ভব। আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.)-কে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহর রসূলের চরিত্র কেমন ছিল? উত্তরে আয়েশা (রাযি.) বলেন, কুরআনই আল্লাহর রাসূলের চরিত্র ছিল। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৬)

বলা বাহুল্য, কুরআনকে চরিত্র বানানোর অর্থ হাদীস ছেড়ে দেয়া নয়। কুরআন অনুসরণ করতে গেলে হাদীসকেও অবশ্যই মানতে হবে। কারণ কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহকে অনুসরণ করার নির্দেশের সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণের কথাও বলা হয়েছে। এজন্যই প্রিয় নবীজি এ উম্মতকে অধপতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষনে পবিত্র কুরআনকে আকড়ে ধরার পাশাপাশি সুন্নাতে রাসূলকেও আকড়ে ধরতে বলেছেন। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল বিদায় হজের ভাষণে ইরশাদ করেছেন, ‘আমি তোমাদের মাঝে দুইটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতদিন এ দুইটি বস্তু আকড়ে রাখবে ততদিন তোমরা পথ হারাবে না আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাত (হাদীস)।’ (সহীহ মুসলিম : ১২১৮; সহীহ ইবনে হিব্বান : ৬৫৬৪; সুনানে আবুদাউদ : ১৯০৫; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩০৭৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১৪৭০৫)

যতদিন মুসলমানের হাতে থাকবে কুরআন, পথ হারাবে না মুসলমান। যতদিন মুসলমানের জীবনে থাকবে রাসূলের পয়গাম, ততদিন সমুন্নত থাকবে মুসলিম উম্মাহর জয়গান। এটাই এ উম্মতের অধপতনের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। তাইতো ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, ‘এ উম্মতের পরবর্তীরা সেভাবেই সংশোধন হবে যেভাবে সংশোধন হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা।’ যে জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির সম্মানে ভূষিত হয়েছে কুরআনের কারণে, সে জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে আসবে কুরআন দিয়েই। অন্য কোনো মতবাদ ও দর্শন কিংবা ভিন্ন কোনো পথ ও সংবিধান এ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে আনতে পারবে না এবং তা সম্ভবও নয়। এখানে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) এর সেই ঐতিহাসিক উক্তিটি খুবই প্রাসঙ্গিক, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের প্রাক্কালে তিনি সাহাবী হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাযি.)-কে বলেন, ‘নাহনু কওমুন আ’আযযানা-ল্লাহ্ বিল ইসলাম ফা মাহমাব তাগাইনাল ইজ্জাতা ফী গাইরিহী আযাল্লানা-ল্লাহ্’ অর্থাৎ আমরা সেই জাতি

যাদেরকে আল্লাহ ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন, সুতরাং আমরা যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে সম্মান খুঁজি তবে আল্লাহ আমাদেরকে পদে পদে লাঞ্চিত ও অপমানিত করবেন।’ আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, ইসলাম আমাদের নিকট এসেছে কুরআনের মাধ্যমে। তাই কুরআনের কাছে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমেই আমাদের সম্মান এবং এ জাতির অধপতন থেকে বাঁচার উপায় নিহিত রয়েছে।

কুরআন তিলাওয়াত, হিফজ ও তাদাব্বুর

কুরআন কারীম আল্লাহ তাআলার কালাম। যার সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ তাআলার সাথে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিলকৃত সর্বশেষ এ রাক্বানী পয়গামের যেসব হক আমাদের ওপর রয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হক হল, হেদায়েতপূর্ণ এই কিতাবের নিয়মিত তিলাওয়াত, হিফজ এবং গভীর মনোযোগ ও তাদাব্বুরের মাধ্যমে জীবনের পথ খুঁজে নেওয়া।

কুরআন তিলাওয়াত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কুরআন মাজীদ পাঠকে শ্রেষ্ঠতম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা কুরআন তিলাওয়াতে রয়েছে মহান কল্যাণ ও বিরাট উপকারিতা। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তাআলার বাণীঃ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
“নিশ্চয়ই এ কুরআন সেই পথ দেখায় যা সোজা ও সুপ্রতিষ্ঠিত, আর যারা সৎ কাজ করে সেই মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।” (সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৯)

আর কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলতের দলীল হাদীস শরীফে রয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

“তোমরা কোরআন পাঠ করো, কেননা কিয়ামতের দিন কোরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৯১০)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “যে ঘরে কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, সেখানে প্রশান্তি ও বরকত নাজিল হয়।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস ৭৯৬)

প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা হলো মুসলমানের পক্ষ থেকে তার রবের কিতাবের প্রতি সু-সেবা প্রদর্শন এবং প্রতিদিনের অঙ্গীকারের পুনর্নবীকরণ। মুসলমানের জন্য কুরআনের সাথে একটি দৈনিক অঙ্গীকার থাকা উচিত। সে যেন প্রতিদিন কুরআনের হিদায়াতের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আহরণ করে। কেননা কুরআন হচ্ছে এক নবায়নশীল শক্তি, অফুরন্ত অনুগ্রহ ও কল্যাণের উৎস। প্রতিদিন নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করার মাধ্যমে মুসলমানের জীবনে বিরাট কল্যাণকর প্রভাব সৃষ্টি হয়।

কুরআন তিলাওয়াতের আরো কয়েকটি ফযীলত

- ❖ **অন্তরের প্রশান্তি- আনন্দ ও সুখের অনুভূতি:** যে ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করে ও আয়াতসমূহ হিফজ করে, সে এক আশ্চর্য প্রশান্তি লাভ করে, যার মাধ্যমে জীবনের সব কষ্ট মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
“যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি পায়।” (সূরা রাদ, আয়াত ২৮)
- ❖ **স্মৃতিশক্তির দৃঢ়তা-মেধাকে চিন্তা শক্তির বিকাশ সাধনে স্বচ্ছতা দান:** মুসলমানের স্মৃতিশক্তি শক্তিশালী রাখার জন্য সর্বোত্তম জিনিস হলো কুরআনের আয়াতসমূহ, যেগুলো সে মুখস্থ করে, চিন্তা করে এবং তাদাব্বুর করে।
- ❖ **সাহস ও আত্মশক্তি অর্জন:** ভয়, দুঃখ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও রোগ থেকে মুক্তি লাভ: নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণ করলে মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়, যা তাকে অনেক দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে রক্ষা করে।
- ❖ **ভাষায় শক্তি ও বোঝাপড়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি:** কুরআনের বাগ্মিতা, সুস্পষ্টতা এবং শক্তিশালী ভাষার কারণে তিলাওয়াতকারীর ভাষাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়—বিশেষ করে যখন সে এর অর্থ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে। নিয়মিত কুরআনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা মানুষকে সর্বদা এর অর্থ-বিষয়ক চিন্তায় রাখে, তাকে তাফসীরের বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করে এবং নতুন নতুন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেয়।
- ❖ **সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি:** কুরআনের আলো তার আচার-আচরণে প্রকাশ পায়, ফলে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী হয়।
- ❖ **আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দুনিয়ার কাজে বরকত:** কুরআন পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়, রিযিকে বরকত আসে এবং অনেক বিপদ থেকে মুক্তি মেলে।
- ❖ **আখিরাতে জান্নাত লাভ:** কিয়ামতের দিন কুরআন পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে এবং তাকে জান্নাত লাভ করাবে।

হিফজ

কুরআন হিফজ বা মুখস্থ করার অসংখ্য ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে। হাদিস ও কুরআনের আলোকে তার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ❖ **জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা:** কিয়ামতের দিন হাফেজকে বলা হবে, “কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকো এবং জান্নাতের উপরের দিকে আরোহণ করতে থাকো। অক্ষর ও শব্দ স্পষ্ট করে তিলাওয়াত করতে থাকো, যেভাবে দুনিয়াতে তিলাওয়াত করতে। তোমার তিলাওয়াতের সর্বশেষ আয়াত সংখ্যা বরাবর জান্নাতে তোমার সর্বোচ্চ স্থান হবে।”
- ❖ **সম্মানিত ফেরেশতাদের সান্নিধ্য:** যে ব্যক্তি কোরআনে দক্ষ, সে সম্মানিত ও পবিত্র ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। আর যে কষ্ট করে বারবার কোরআন পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।
- ❖ **হাফেজ আল্লাহর পরিবারভুক্ত:** হাদিসে কোরআনের ধারক-বাহকদের (হাফেজদের) আল্লাহর পরিবার ও বিশেষ প্রিয়জন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ❖ **পিতামাতার জন্য বিশেষ সম্মান:** হাফেজদের পিতামাতাকেও পরকালে বিশেষ সম্মানিত করা হবে। তাদের মাথায় নূরের মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল হবে।
- ❖ **সুপারিশ করার সুযোগ:** যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করবে, তিলাওয়াত করবে এবং মুখস্থ করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার বংশধরদের মধ্য থেকে এমন দশজনকে সুপারিশ করার সুযোগ দেবেন, যাদের উপর জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছিল।
- ❖ **দ্বিগুণ সওয়াব:** যে কোরআন হেফজ করে এবং সবসময় তেলাওয়াত করে তার তুলনা লেখার কাজে নিয়োজিত পবিত্র সম্মানিত ফেরেশতাদের মতো। আর যে কষ্ট করে তেলাওয়াত করে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।
- ❖ **শয়তান থেকে ঘর নিরাপদ:** যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় এবং হিফজ করা হয়, সে ঘর শয়তান থেকে নিরাপদ থাকে এবং সেখানে বরকত ও শান্তি বিরাজ করে।
- ❖ **বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতিশক্তির উন্নতি:** কুরআন হিফজ করা মানুষের মেধা, মননশীলতা ও স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এগুলো ছাড়াও কুরআন হিফজ করা একটি মহান ইবাদত এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক শান্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

তাদাব্বুর

তাদাব্বুর (تَدَبُّر) অর্থ গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা। অনুধ্যান করা। সাধারণত কুরআন কারীমের আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনাকে তাদাব্বুর বলে। খোদ কুরআন কারীমেরই বিভিন্ন স্থানে এ ব্যাপারে উৎসাহ ও তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

“তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি অন্তরে লেগে আছে তালা?” (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭, আয়াত ২৪)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

“তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হলে এর মধ্য বহু অসঙ্গতি পেত।” (সূরা নিসা ০৪, আয়াত ৮২)

كَتَبْنَا إِلَيْكَ مِائَةً مِائَةٍ لِيَذَكَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ.

“হে রাসূল! এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতের মধ্যে চিন্তা করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।—(সূরা ছদ ৩৮, আয়াত ২৯)

সেসব মুমিনের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা বুঝে শুনে কুরআনের উপদেশ ও হেদায়েত গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.

“এবং যখন তাদের প্রতিপালকের আয়াত দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা বধির ও অন্ধরূপে তার ওপর পতিত হয় না।” (সূরা ফুরকান, আয়াত ৭৩)

তাদাব্বুরের সম্পর্কে সালাফদের বাণী

ইবনে সিনান সুলামী একবার আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বললেন, আমি আজ রাতে এক রাকাতে মুফাসসাল তিলাওয়াত করেছি। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন—

هَذَا مِثْلَ هَذَا الشَّعْرِ، أَوْ نَثْرًا مِثْلَ نَثْرِ الدَّقْلِ؟ إِنَّمَا فُضِّلَ لِتُقْصَلُوا.

কবিতা আওড়ানোর মতো আওড়িয়েছ? বা কাঁদি থেকে পাকা খেজুর (টপটপ করে) পড়ার মতো দ্রুত পড়েছ? (কুরআনের) মুফাসসাল অংশ তো এজন্যই ছোট ছোট অংশে নাযিল হয়েছে, যাতে তোমরা ধীরে-সুস্থে থেমে থেমে তারতীলের সঙ্গে তিলাওয়াত কর। (মুসনাদে আহমাদ, বর্ণনা ৩৯৫৮; শরহু মাআনিল আছার, বর্ণনা ২০৩৩)

হাসান ইবনে আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَأَى الْقُرْآنَ رَسَائِلَ مِنْ رَبِّهِمْ، فَكَانُوا يَتَذَكَّرُونَهَا بِاللَّيْلِ، وَيَتَفَقَّدُونَهَا بِالنَّهَارِ.

তোমাদের পূর্ববর্তীরা কুরআনকে আপন রবের বার্তা জ্ঞান করতেন। রাতে তারা চিন্তা ও মনোযোগসহ তা পাঠ করতেন। এবং দিনে নিজেদের জীবনযাত্রায় ওই বিষয়গুলোর খেয়াল রাখতেন।^৮

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বসরী (রাহ.) বলেন—

نَزَلَ الْقُرْآنُ لِيَتَذَكَّرُوا وَيَعْمَلُوا بِهِ، فَاتَّخِذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا.

কুরআন কারীম নাযিল করা হয়েছে, যেন তোমরা তাদাব্বুর ও চিন্তা-ভাবনা কর এবং এর ওপর আমল কর; সুতরাং আমলের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করতে থাক।^৯

তাদাব্বুরে কুরআনের গুরুত্ব ও ফায়েদার ব্যাপারে ইবনুল কায়্যিম রাহ. লিখেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর এবং মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী করে— দীর্ঘ সময় কুরআন কারীমের তাদাব্বুর ও একেকটি আয়াতের অর্থে গভীর মনোযোগসহ চিন্তা করা। এর চেয়ে কার্যকরী আর কিছু নেই। কারণ কুরআন মানুষকে—

- কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে সবিস্তারে ধারণা দেয়।
- কল্যাণ-অকল্যাণের পথ দেখায়, এর কারণ ও ফলাফলসহ উভয়ের পরিণতি সম্পর্কে বাতলে দেয়।
- সৌভাগ্যের চাবিকাঠি ও উপকারী জ্ঞানের দিশা দেয়।
- ঈমানের ভিত্তিমূলকে তার অন্তরে প্রোথিত করে দেয়।
- তাকে দুনিয়া-আখেরাতের বাস্তবতা দেখিয়ে অন্তরে জাহ্নাত-জাহান্নামের ভাবনা গেঁথে দেয়।
- বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করে এবং শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে বলে।
- আল্লাহর অনুগ্রহ ও ইনসাফ সম্পর্কে বলে।
- আল্লাহ তাআলার সত্তা, নাম ও গুণাবলি এবং কর্মপন্থা, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার পথের দিশা দেয়।^{১০}

তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. বলেন, পাঁচটি বিষয় দিলের ঔষধ— তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা, কম খাওয়া, রাতে ইবাদত করা, শেষ রাতে রোনাজারি করা ও নেককারদের সোহবত গ্রহণ করা।^{১১}

মালেক ইবনে দীনার রাহ. বলতেন—

يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ! مَاذَا زَرَعَ الْقُرْآنُ فِي قُلُوبِكُمْ؟ فَإِنَّ الْقُرْآنَ رَيْبُ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا أَنَّ الْغَيْثَ رَيْبُ الْأَرْضِ، فَقَدْ يَنْزِلُ الْغَيْثُ مِنَ السَّمَاءِ فَيُصِيبُ الْحَشَّ فِيهِ الْحَبَّةُ، وَلَا يَمْنَعُهُ نَنْنٌ مَوْضِعَهَا أَنْ تَهْتَرَّ وَتَخْضَرَّ وَتَحْسُنَ فِيهِ، حَمَلَةُ الْقُرْآنِ مَاذَا زَرَعَ الْقُرْآنُ فِي قُلُوبِكُمْ؟ أَيْنَ أَصْحَابُ سُورَةٍ؟ أَيْنَ أَصْحَابُ سُورَتَيْنِ؟ مَاذَا عَمِلْتُمْ فِيهَا.

হে কুরআনের বাহকগণ! কুরআন তোমাদের অন্তরে কী বপন করেছে? নিশ্চয়ই কুরআন মুমিনের বসন্ত, যেমন বৃষ্টি জমিনের জন্য বসন্তের ওসিলা হয়। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলে তা এমন এক স্থানে পড়ে, যেখানে কিছু বীজ থাকে। স্থানটি দুর্গন্ধযুক্ত হলেও, তা বীজকে অঙ্কুরিত হওয়া, সতেজ হওয়া এবং সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা থেকে বিরত রাখতে পারে না।

হে কুরআনের বাহকগণ! কুরআন তোমাদের অন্তরে কী বপন করেছে? কোথায় সেই ব্যক্তি, যে এক সূরার অধিকারী? কোথায় সেই ব্যক্তি, যে দুই সূরার অধিকারী? তোমরা এ অনুযায়ী কী আমল করেছ?^{১২}

সর্বযুগের বুয়ুর্গদের কিতাবেই এমন বহু বাণী ও প্রবচন রয়েছে। মূল বিষয় হল, মানুষ কুরআনের সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করবে, তিলাওয়াত করবে, চিন্তা-ভাবনা সহকারে কুরআনের বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল রাখবে এবং কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী আমল করবে, তাহলে সত্যের পথে অটল-অবিচল থাকতে পারবে। গোমরাহী থেকে বাঁচতে পারবে। শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে।

কুরআন উপলব্ধি এবং উম্মতের পূর্বসূরিগণ

বিভিন্ন কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্বসূরিগণের এমন বহু ঘটনা রয়েছে, যা থেকে পাথের লাভ করা যায় এবং জযবা ও উদ্দীপনা বাড়ে। চিন্তা-ফিকির করে কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা অন্তরের ব্যাধি দূর হয়। যাহের ও বাতেন সংশোধনের ওসিলা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সারা রাত একটি আয়াত তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সে আয়াতটি হল—

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

আপনি তাদেরকে শাস্তি দিলে তারা তো আপনারই বান্দা আর তাদেরকে ক্ষমা করে দিলে নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদা, আয়াত ১১৮)

এই ঘটনায় উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরদের পাশাপাশি তাদাব্বুরে কুরআনের একটি আলোকিত দিক উঠে আসে।

রাতভর একই আয়াত তিলাওয়াত ও ফিকির করা অবস্থায় কেটেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এই উম্মতের নেককার পূর্বসূরিদের এমন বহু ঘটনা রয়েছে।

উসমান ইবনে আফফান রা. বলতেন—

لَوْ طُهِرْتُ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعْتُمْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

যদি তোমাদের অন্তর নিষ্কলুষ হত, তোমরা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে পরিতৃপ্ত হতে পারতে না।^{১৩} হাসান বসরী রাহ. একবার সারা রাত এই আয়াত পড়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন—

وَإِنْ تُعَذِّبُوا نِعْمَةً اللَّهُ لَا تُخْصُوهَا.

যদি আল্লাহর নিআমত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। (সূরা নাহল, আয়াত ১৮)

এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—

إِنَّ فِيهَا مُعْتَبَرًا، مَا نَرْفَعُ ظَرْفًا وَلَا نَزِدُّهُ إِلَّا وَقَعَ عَلَى نِعْمَةٍ، وَمَا لَا نَعْلَمُهُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ أَكْثَرُ.

এই আয়াতে অনেক বড় শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। আমরা চোখ মেললেই তো অনেক অনেক নিআমত দেখতে পাই। আর যা দেখি না এর সংখ্যাও তো অনেক বেশি।^{১৪}

মৌলভী সায্যিদ মুহাম্মাদ আলী সাহেব বলেন, শুরুর দিকে আমি হযরতকে আরজ করেছিলাম, কবিতার মধ্যে আমি যে মজা পাই, তা কুরআন কারীমে পাই না! তিনি বলেছিলেন, এখনো (কুরআনের সাথে, আল্লাহর সাথে) দূরত্ব রয়েছে। নৈকট্য অর্জন করতে পারলে কুরআনে যে স্বাদ পাবে, তা অন্য কোথাও পাবে না। একদিন তিনি বলেছিলেন, নিসবতে কুরআন হল, সুলূকের সর্বোচ্চ পর্যায় অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির সর্বোচ্চ স্তর। অর্থাৎ তায়কিয়া ও সুলূকের চূড়ান্ত মাকসাদ কুরআন কারীমের নিসবত হাসিল হওয়া।^{১৫}

কুরআন কারীম থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য কিছু বিষয় আছে করণীয়, কিছু বিষয় আছে বর্জনীয়। কুরআন কারীমের সম্মান ও আদব, তাকওয়া ও তাহরাত, ইখলাস, দুআ, রাতের নামায, আন্তরিক চাওয়া, অনুসরণের জযবা, আল্লাহর ভয়, গায়েবের প্রতি ঈমান, গভীর চিন্তা-ভাবনা, নফসের মুজাহাদা ইত্যাদি আমল তাদাব্বুরে কুরআনের ক্ষেত্রে সহায়ক ও করণীয়। তেমনি বেয়াদবি ও অসম্মান, বক্রতা ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী হওয়া, অহংকার, দম্ভ, কুরআন বুঝতে অবহেলা, গুনাহ, দলীল-প্রমাণ ছাড়াই তর্কবিতর্ক করা, পরকাল অস্বীকার ও দুনিয়ামুখিতা ইত্যাদি তাদাব্বুরে কুরআনের ক্ষেত্রে বড় বাধা।

শিক্ষাব্যবস্থায় কুরআন

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যতবেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা একটি আদর্শিক শিক্ষা। আবহমান কাল থেকে মানব জাতির ইতিহাসে ধর্মই সভ্যতার প্রধান জীবনী শক্তিরূপে কাজ করে আসছে। ধর্ম বিশ্বাসই মানুষকে সততা ও পুণ্যের পথে পরিচালিত করেছে। আল্লাহর উপর ভক্তি মানুষের অহমিকা ও দাস্তিকতাকে খর্ব করে তাকে সংযমী ও বিনয়ী করে তোলে। মানুষের দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণাঙ্গ ও সুষম উন্নয়নই শিক্ষার উদ্দেশ্য। মৌলিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মানব সভ্যতার ভিত্তি। শিক্ষার মধ্য দিয়েই তার বিকাশ হওয়া প্রয়োজন এবং এ দিকেই মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ থাকা উচিত। বর্তমান প্রজন্ম যে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে এটি হয়তোবা বাস্তবসম্মত কিন্তু এটি কতটুকু ধর্মীয় শিক্ষার পরিচয় বহন করে তা স্বভাবতই সকলের জিজ্ঞাস্য।

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও অদ্যাবধি জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে ইসলাম শিক্ষা বা কুরআনের শিক্ষা যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি। ফলশ্রুতিতে উপযুক্ত দ্বীনি শিক্ষা না থাকায় ক্রমশঃই এদেশের মানুষ নীতি-নৈতিকতা ও মানসিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অপরাধ প্রবণতাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। দুর্নীতি, অবৈধ উপার্জন, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, পরকীয়া, যেনা-ব্যভিচার, প্রতারণা প্রভৃতিতে মানুষ আকর্ষণ নিমজ্জিত হচ্ছে। যা সর্বত্র মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। মূলত আদর্শিক শিক্ষার অভাবই এজন্য দায়ী। জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে প্রত্যেক স্তরে ইসলাম শিক্ষা পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যকর হলে ইসলামের মৌলিক ও মানবিক মূল্যবোধ এবং নীতি-নৈতিকতা সম্বন্ধে মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে। নীতিভ্রষ্ট ও নীতিহীন থেকে জাতি মুক্তি পাবে। কেননা মানবতার সকল সমস্যা নিরসনে ইসলাম শিক্ষা ঐতিহাসিক ও বাস্তবসম্মতভাবে স্বীকৃত। অতএব বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে ইসলাম শিক্ষার আবশ্যিকতা ও রূপরেখা যথাযথভাবে আলোচিত হলে ভবিষ্যত প্রজন্ম সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠবে।

ইসলামি শিক্ষার উদ্দেশ্য

ইসলামি শিক্ষানীতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো:

- শিক্ষার্থীদেরকে মানুষ ও এই বিশ্বজগতের সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, মালিক, শাসক মাবুদ সার্বভৌম ও সর্বময় কর্তৃত্বশীল মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, আস্থাশীল, অনুগত ও বিনীতি করে তোলা তথা তাদেরকে এক আল্লাহমুখী করে গড়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীদেরকে রিসালাতে বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মাঝে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সর্বশেষ নবী ও রসূল হিসেবে মানার এবং তাঁকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীদের পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মধ্যে পরকালের সাফল্য ও ব্যর্থতাকেই প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহণ করার স্বচ্ছ জ্ঞান ও বুঝ সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে পরকালের মুক্তির আকাংখা ও উদ্বিগ্ন সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল্লাহর দাস (আবদ) ও প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রেরণা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র বিবেকবোধ ও বলিষ্ঠ নৈতিক চেতনা জাগ্রত করে দেয়া।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মপোলক্কি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপর্যালোচনার ভাবধারা সৃষ্টি করা।
- সময় ও সমাজ চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষ, জীবন ও কর্মমুখী, সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, উদ্যমী ও সাহসী মানুষ সৃষ্টি করা।
- সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যথাযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।
- সৎ, চরিত্রবান, নীতিবান ধার্মিক ও বিবেকবোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা। উৎপাদন ও কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।
- আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধন করা।
- সময় ও যুগের চাহিদা মারফিক দক্ষ ও যোগ্য গবেষক, আবিষ্কারক, চিন্তাবিদ, লেখক, বিচারক, শিক্ষক, সৈনিক, সমাজকর্মী, প্রশাসক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি এবং সকল ক্ষেত্রে ও বিভাগ পরিচালার উপযুক্ত লোক তৈরি করা।

- সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবণতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকশিত করা। তাদের মধ্যে ইজতেহাদী যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
- আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জীবন, জগত ও পরকালীন মুক্তি লক্ষ্যের মাঝে সমন্বয়ে সাধনের যোগ্যতা অর্জন, জীবনের পূর্ণত্ব অর্জন এবং জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন।
- নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জানা এবং তা সংরক্ষণ ও বিকাশের যোগ্যতা ও প্রেরণা লাভ করা।
- জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিজস্ব বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

ইসলামি শিক্ষানীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য

- ✓ **জ্ঞানের মূল উৎস ওহীর জ্ঞান:** ওহী হলো, মানব জাতির ইহ ও পারলৌকিক সর্বাঙ্গীন উন্নতি, কল্যাণ ও সাফল্যের উদ্দেশ্যে নবী রসূলদের মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নির্দেশনা বা হিদায়াত। ওহী খোদায়ী জ্ঞান লাভের মাধ্যম। আর এই ওহীই জ্ঞানের মূল উৎস।

আল কুরআন আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহী। এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে। সুতরাং আল কুরআনই মানবজাতির জন্যে জ্ঞানের মূল সূত্র, মূল উৎস। আল কুরআনকেই শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অতপর গোটা শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রমকে এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে সাজাতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে এ নির্ভুল ভিত্তির উপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ আল কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তিনিও সে ব্যাখ্যা করেছেন ওহীর ভিত্তিতে, নিজের খেয়াল খুশি মতো নয়। সুতরাং রসূলের (সা) সুন্নাহকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস ও মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে সাজানো শিক্ষা ব্যবস্থাই কেবল মানবতার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কারণ তা জ্ঞানের মূল সূত্র থেকে উৎসারিত হয়। আর এটাই ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ার কথা।

আল কুরআনকে আল্লাহ তাআলা -হুদািল্লাস- মানুষের জীবন যাপনের সঠিক পথনির্দেশ বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং মানুষকে তার জীবন যাপনের সঠিক পথ জানতে হলে কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কুরআনের জ্ঞানার্জনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আর হাদীস ও সুন্নাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু কুরআনেরই প্রাসংগিক জিনিস, তাই কুরআনের সাথে সুন্নাহকেও অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

- ✓ **শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা:** মাতৃভাষা তথা জাতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। জ্ঞানের সকল উৎস এবং সব ভাষা থেকেই জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবে তা বুঝতে হবে এবং বুঝাতে হবে জাতীয় ভাষায়। নবী রসূলরা প্রত্যেকেই জাতির জনগণের ভাষায় শিক্ষাদান করেছেন: যেমন মহান আল্লাহে এরশাদ করেছেন, “আমি যখনই কোনো রাসূল পাঠিয়েছি সে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছে স্বজাতির ভাষায়, যেনো সে সমস্ত উপদেশ আহ্বান তাদের খুলে বলতে পারে।” (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৪)

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যনমূহ:

- যেহেতু জ্ঞানের মূল উৎস আল কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ ও সংরক্ষিত হয়েছে, তাই আরবি ভাষাকে প্রচলিত ইংরেজির পাশাপাশি দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষাদান করতে হবে। প্রাথমিক স্তরেই আল কুরআন পড়তে শিখাতে হবে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সরাসরি দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দান করতে হবে। উচ্চতর শ্রেণীসমূহে এবং উচ্চ শিক্ষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হবে। তাছাড়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামি আইনের বিশেষজ্ঞ তৈরির ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- দীনি ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।
- শিক্ষাকে সার্বজনীন, সহজলভ্য ও উন্মুক্ত করতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- শিক্ষা হবে প্রয়োগমুখী, জীবনমুখী ও কর্মমুখী; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে পাশাপাশি।
- শিক্ষকতার পেশা হবে সবচেয়ে সম্মানীয়। শিক্ষকরা হবেন সত্যের সাক্ষ্য। শিক্ষকদের নৈতিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ হবে বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য সম্ভার ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির সহায়ক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- প্রাথমিক স্তর থেকেই সুন্দর আচার আচরণ তথা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে।
- পাঠ্যসূচিতে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত করতে হবে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্বাস্থ্য ও সামরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হবে।
- পুরুষদের মতো নারীদের শিক্ষাও হবে বাধ্যতামূলক।
- অবাধ সহশিক্ষা থাকবে না।
- মসজিদসমূহকেও শিক্ষায়তনে পরিণত করা হবে।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে চিরন্তন। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে গতিশীল (Dynamic)। শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন অন্তর্গত (in built) ব্যবস্থা থাকবে, যাতে করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠক্রম, পরিসর, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনের পূর্ণবিন্যাস অনায়সেই করা সম্ভব হয়।
- শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে ঈমান ও আদর্শিক মূল্যবোধ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত বিশ্বাসের চেতনাকে।

- শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান উভয়টাই সমগুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।. শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান উভয়টাই ইবাদত।
- শিক্ষাদান পেশা নয়, মিশন।
- অর্জিত জ্ঞান অবশ্যি চরিত্র ও কর্মে প্রয়োগ করতে হবে।
- ইসলাম আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষাকেই উৎসাহিত করে।
- সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিভাগের ছাত্রদের জন্যে তফসীরসহ আল কুরআন (বা আল কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ) এবং নির্বাচিত সংখ্যক হাদীস শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে।
- উচ্চ শিক্ষা হবে গভেষণা ও ইজতিহাদমুখী।
- সকল বিভাগের ছাত্রদেরকে ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ অনুশীলন করে শিখাবার ব্যবস্থা থাকবে।
- ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে থাকবে সমন্বয়, যোগসূত্র ও সুসম্পর্ক।
- ছাত্রদের গড়ে উঠানো হবে স্বাধীনতা রক্ষার সৈনিক, আদর্শের প্রচারক ও সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে।
- শিক্ষা প্রশাসন হবে দুর্নীতিমুক্ত, সহজ, গতিশীল ও শিক্ষা উন্নয়নের সহায়ক।
- শিক্ষানীতি হবে ইসলামি সংস্কৃতির উৎসস্থল। শিক্ষার সকল স্তরে ও সকল বিভাগে ইসলামি সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

জীবনধারায় কুরআনকে বাস্তবায়ন

জীবনধারায় কুরআন বাস্তবায়ন বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআনের শিক্ষা ও বিধানগুলো মেনে চলা। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদের সাথে দয়া, সহানুভূতি ও শান্তির সাথে আচরণ করা, পারিবারিক বন্ধন বজায় রাখা, দানশীলতা ও উদারতা অনুশীলন করা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত আইন ও নৈতিকতা অনুসরণ করা।

মানব জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু এবং সকল ক্ষেত্র তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক ও আধ্যাত্মিক সহ সামগ্রিক উক্ত ক্ষেত্রগুলো সুন্দর, সহজ এবং শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণভাবে পরিচালনা করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে জীবন ব্যবস্থা বলা হয়। আর ইসলাম হলো আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত একটি ভারসাম্যপূর্ণ, পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী জীবন ব্যবস্থা। যেখানে মানব জীবনের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পেশ করা হয়েছে।

ইসলাম প্রচলিত কোন ধর্মের নাম নয় বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা। কেননা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বান্দার কোন বিধানে কল্যাণ ও মুক্তি রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার পক্ষেই অবগত হওয়া সম্ভব এই কারণে যে, তিনিই বিশ্বজাহানের একমাত্র ও একচ্ছত্র প্রভু ও মালিক। তাই সর্বত্র কল্যাণ ও শান্তির জন্য ইসলামের চূড়ান্ত সংবিধান ও জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনের মত জগদ্বিখ্যাত নির্ভুল গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। যেখানে ক্রিয়ামত পর্যন্ত মানবতার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যার পরিপূর্ণতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশাতেই লাভ করেছে। যাতে মানুষের সার্বিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সবকিছুই পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

مَا فَرَّظْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

“আমরা এই কিতাবে (কুরআনে) কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি” (সূরা আল-আন‘আম, আয়াত ৩৮)। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

“আর আমরা আপনার উপরে প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি” (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৮৯)।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

لَوْ ضَاعَ لِي عَقْلٌ بَعِيرٌ لَوَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“আমার উট বাঁধার একটি দড়িও যদি হারিয়ে যায়, তাহলে আমি তা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে খুঁজে পাব”।^{১৬} আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

قَدْ بَيَّنَّا لَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلَّ شَيْءٍ

“এই কুরআনে প্রত্যেক ইলম ও সকল কিছুর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে”।^{১৭}

তিনি আরো বলেন, “সাধারণভাবে আল-কুরআনে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিশ্চয় আল-কুরআনে পূর্ববর্তী ও ভবিষ্যতের সকল উপকারী ইলম সম্পর্কে সংবাদ রয়েছে। প্রত্যেক হালাল ও হারামের বিধান সম্পর্কেও আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া মানুষের দুনিয়াবী, দ্বীনি, জীবনপদ্ধতি ও পরকাল সম্পর্কে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা আল-কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে”।^{১৮}

আল্লাহ তা‘আলা (রাহিমুল্লাহ) বলেন, فِي أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَفِي أَحْكَامِ الدَّارَيْنِ وَكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ، “দ্বীনের মূল ও শাখাসমূহের নীতিমালাসমূহ, দুনিয়া ও আখিরাতের বিধি-বিধানসমূহ এবং বান্দার প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে আল-কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে”।^{১৯}

অতএব আল্লাহ তা‘আলা কুরআনকে বিশ্ব মানবতার জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তাকে বাস্তবে রূপদান করার দায়িত্ব দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন। আর আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত উক্ত দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে বাস্তবায়নও করেছেন। এক্ষেত্রে সামান্যতম ত্রুটিও করেননি। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكَمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ.

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এমন কোন জিনিসই আমি (বর্ণনা করতে) ছাড়িনি। আর আমি তার হুকুম তোমাদেরকে অবশ্যই দিয়েছি। আর আমি এমন কোন জিনিসই ছাড়িনি যা আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তা অবশ্যই নিষেধ করেছি”।

আল্লাহ তা‘আলা ইসলামের যাবতীয় নির্দেশনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হিসাবে আল-কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا وَانزَلْنَا إِلَيْهِمْ “আমরা আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে পরস্পরভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল” (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪)।

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَخُذُوهُ * وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক” (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)।

ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের বাস্তবায়ন

একজন মানুষ মুসলিম হওয়া নিঃসন্দেহে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। ইসলামই আমাদের মর্যাদার প্রতীক। এর মাধ্যমেই এ পার্থিব জগতে যেমন শান্তি ও সাফল্য পাওয়া যাবে ঠিক তদ্রূপ পরকালীন জীবনে পাওয়া যাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা। কিন্তু আজকে আমরা অনেকেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইসলামী সৌন্দর্যের দিকগুলো জানিইনা। যার কারণে তার মাঝে ইসলামী ব্যক্তিত্বের ছোয়া পরিলক্ষিত হয় না। একজন মুসলিমের ব্যক্তিত্ব কেমন হওয়া উচিত এ ব্যাপারে নিম্নে কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরা হলো:

১. ঈমানের মূল বিষয় এবং শাখাপ্রশাখার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

ঈমানের মূল বিষয় হল, আল্লাহর উপর অবিচল, অটুট ও দৃঢ় বিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও তার দেওয়া দীনের আনুগত্য করা। ঈমানের শিকড় খুবই মজবুত এবং দৃঢ়। ঈমানের পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। ঈমানের মৌলিক বিষয় ও এর শাখাপ্রশাখা আছে।

আবু হোরাযরা (রা.)-র বর্ণনায় আছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইমানের সত্তর অথবা ষাটের বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি বা তাওহীদের ঘোষণা দেওয়া। সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ইমানের অন্যতম একটি শাখা।’ (বুখারি, হাদিস: ৯; মুসলিম, হাদিস: ১৬২)

উল্লিখিত হাদিসের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ইমানের নানামুখী শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ইমানের শাখা-প্রশাখার প্রত্যেকটি মর্যাদাগত বিবেচনায় সমান নয়। কোনো কোনো শাখার মর্যাদা ও গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি, আবার কোনো কোনো শাখার মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলনামূলক কম। ইমানের সব শাখা-প্রশাখা যে মুমিন-মুসলমানের মধ্যে পাওয়া যাবে, তিনি কামিল মুমিন। পক্ষান্তরে যে মুমিন-মুসলমানের মধ্যে যত কম শাখা-প্রশাখা পাওয়া যাবে, তিনি তত দুর্বল বা ত্রুটিযুক্ত মুমিন।

ঈমানের মৌলিক বিষয় হলো ৬ টি।

ক) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

ঈমানের ছয়টি মৌলিক স্তম্ভের প্রথম এবং প্রধান স্তম্ভ হলো মহান আল্লাহর ওপর ঈমান তথা বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

খ) ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। তারাও আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘...বরং ফেরেশতারা তো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তারা আগ বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে।’ (সূরা আশ্বিয়া ২৬-২৭)

গ) আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলা মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য নবী-রসুলদের ওপর বিভিন্ন আসমানি কীসের নাজিল করেছেন। সেই কিতাবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের মৌলিক স্তম্ভ। এ ধরনের কিতাবগুলো হচ্ছে—কোরআন, তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল। এ কিতাবগুলোর কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন। ঈমান আনার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করে, ‘বলে দাও, আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।’ (সূরা শূরা, আয়াত ১৫)

ঘ) রসুলদের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অনেক নবী-রসুল পাঠিয়েছেন। সেই রসুলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের মৌলিক স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত। দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির জন্য একজনকে রসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের এক আল্লাহর ইবাদত করার এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর ইবাদতকে অস্বীকার করার দাওয়াত দেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসা এবং তাঁর নিয়ে আসা শরিয়তের আলোকে জীবন পরিচালনা করা মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত।

ঙ) তাকদিরে বিশ্বাস বা ভাগ্যের ভালো মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এই বিশ্বাস রাখা ।

তাকদিরে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাকদিরের শব্দমূল হচ্ছে কদর। এর অর্থ হচ্ছে পরিমাণ নির্ধারণ, পরিমাপ, পরিমিতি, মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট সীমা, মূল্য নিরূপণ, অদৃষ্ট, নিয়তি, ভাগ্য ইত্যাদি। তাকদির হচ্ছে আল্লাহর বিশ্বজনীন নিয়মনীতি। এ নিয়মনীতি ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অধীনে বিশ্বজগৎ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন—এ চেতনা লালন করা এবং তার বিধিব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার মধ্যেই শান্তি ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। কোনো কল্যাণকর কিছু ঘটলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। আর অকল্যাণকর কিছু ঘটলে তওবা-ইস্তেগফার এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল করতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল বা চেষ্টা-তদবির করে যেতে হবে। একেই বলে তাকদিরে বিশ্বাস।

চ) পরকালে বিশ্বাস বা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

পরকাল বা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসও ঈমানের মৌলিক স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত। এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে—

ক. পুনরুত্থানে বিশ্বাস: মৃত ব্যক্তিদের কবর থেকে আবার জীবিত করা হবে। সব মানুষ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে।

খ. হিসাবনিকাশ ও মিজানে বিশ্বাস: সৃষ্টিজীব দুনিয়ায় যেসব কর্ম করেছে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সেসব কর্মের হিসাব নেবেন। মিজান বা পাল্লায় আমলগুলো ওজন করা হবে। যার বদ আমলের চেয়ে নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে সে জাহান্নামি হবে। যার নেক আমলের চেয়ে বদ আমলের পাল্লা ভারী হবে সে জাহান্নামি হবে।

গ. জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস: জান্নাত হলো চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির স্থান। মহান আল্লাহ মুমিনদের জন্য তা তৈরি করে রেখেছেন। আর জাহান্নাম চিরস্থায়ী দুঃখ-কষ্টের স্থান। আল্লাহ এবং তার রসুলের অবাধ্যদের জন্য আল্লাহ তা তৈরি করে রেখেছেন।

ইমানের সংজ্ঞার আলোকে এর শাখা-প্রশাখাগুলোকে মোট তিন ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। ভাগগুলো হলো:

ক. ইমানের কিছু শাখা-প্রশাখা বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত বা সম্পর্কিত। এর সংখ্যা হলো ৩০।

খ. ইমানের কিছু শাখা-প্রশাখা জবান বা মৌখিক স্বীকৃতির সঙ্গে জড়িত বা সম্পর্কিত। এর সংখ্যা হলো ৭ (সাত)।

গ. ইমানের কিছু শাখা-প্রশাখা শরীর বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা আমলের সঙ্গে জড়িত বা সম্পর্কিত। এর সংখ্যা হলো ৪০।

মোট শাখা-প্রশাখা: ক. ৩০ + খ. ৭ + গ. ৪০ = ইমানের ৭৭টি শাখা-প্রশাখা।^{২০}

ক. অন্তর বা বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত শাখা-প্রশাখাগুলো হলো:

১. আল্লাহ-তাআলার প্রতি ইমান আনা। (সুরা নিসা, আয়াত: ১৩৬; মুসলিম, হাদিস: ২৬)
২. আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি, এমন বিশ্বাস লালন করা। (সুরা জুমার, আয়াত: ৬২)
৩. ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখা। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৮৫)
৪. পবিত্র কোরআন ও আসমানি সব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখা। (সুরা নিসা, আয়াত: ১৩৬)
৫. রাসুল (সা.)-সহ সব নবী-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস রাখা। (মুসলিম, হাদিস: ৮)
৬. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখা। (সুরা নিসা, আয়াত: ৭৮; মুসলিম, হাদিস: ৬৫০১)
৭. আখিরাত ও পুনরুদ্বারের প্রতি বিশ্বাস রাখা। (সুরা তাওবা, আয়াত: ২৯)
৮. হাশর, মিজান, কিয়ামত ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখা। (সুরা জাসিয়া, আয়াত: ২৬; সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত: ৪, ৫, ৬; বুখারি, হাদিস: ৬,৫৩১; মুসলিম, হাদিস: ২,৮৬২-৬,৭৯৮-৬,৭৯৯)
৯. জাহ্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস রাখা। (সুরা বাকারা, আয়াত: ৮১; বুখারি, হাদিস: ১,৩৭৯; মুসলিম, হাদিস: ২৮৬৬)
১০. আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা রাখা। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৬৫; বুখারি, হাদিস: ১৫)
১১. আল্লাহর প্রতি ভয় রাখা। (সুরা তাওবা, আয়াত: ১৭৫; সুরা মায়িদা, আয়াত: ৪৪; সুরা বাকারা, আয়াত: ৪০)
১২. আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা, অর্থাৎ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। (সুরা আরাফ, আয়াত: ৫৬; সুরা জুমার, আয়াত: ৫৩; মুসলিম, হাদিস: ৬,৯৬০)

১৩. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখা। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২২, ১৬০; বুখারি, হাদিস: ৫,৭০৫; তিরমিজি, হাদিস: ২,৪৪৬)
১৪. রাসুলুল্লাহকে (সা.) ভালোবাসা। (বুখারি, হাদিস: ১৫; মুসলিম, হাদিস: ৭৫)
১৫. একমাত্র আল্লাহর জন্য কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা করা। (বুখারি, হাদিস: ৬৬০; তিরমিজি, হাদিস: ২৫২১)
১৬. ইখলাসের সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেকোনো কাজ করা। (সূরা বাইয়িনার, আয়াত: ৫; তিরমিজি, হাদিস: ৩,৫৯০; নাসায়ি, হাদিস: ৩,১৪০)
১৭. কোনো গুনাহ বা পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করা। (সূরা তাহরিম, আয়াত: ৮; তিরমিজি, হাদিস: ৩,৫৩৭; মুসলিম, হাদিস: ৭,০৩৬)
১৮. লজ্জা করা। (তিরমিজি, হাদিস: ২,০০৯; মুসলিম, হাদিস: ১৬২)
১৯. নিয়ামতের শোকর আদায় করা। (সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৭; মুসলিম, হাদিস: ৭২২৯)
২০. বৈধ ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পালন করা। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৩৪; বুখারি, হাদিস: ১/৩৩)
২১. ধৈর্য ধারণ করা। (সূরা আনফাল, আয়াত: ৪৬; বুখারি, হাদিস: ৫,৬৫৩-১,২৫২)
- বিনয়ী হওয়া বা তাওয়াজু অবলম্বন করা। (সূরা শুআরা, আয়াত: ২১৫; বুখারি, হাদিস: ৬,২৫৬)
২৩. সৃষ্টিজীবনের প্রতি দয়া করা। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯; বুখারি, হাদিস: ৬,০১৩; মুসলিম, হাদিস: ২,৩১৯)
২৪. সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্টি থাকা বা মেনে নেওয়া। (সূরা আহজাব, আয়াত: ৩৬)
২৫. অহংকার বা আত্মগরিমা ত্যাগ করা। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৪; মুসলিম, হাদিস: ৯১)
২৬. বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ করা। (তিরমিজি, হাদিস: ১,৯২০; আবু দাউদ, হাদিস: ৪,৯৪৩)
২৭. হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ করা। (সূরা ফালাক, আয়াত: ৫; বুখারি, হাদিস: ৬,০৬৫; মুসলিম, হাদিস: ২,৫৫৯)
২৮. রাগ-ক্রোধ ও মনোমালিন্য ত্যাগ করা। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪; বুখারি, হাদিস: ১৩৭)
২৯. কারও অমঙ্গল কামনা না করা মানে সবার কল্যাণ কামনা করা। (সূরা আরাফ, আয়াত: ৬২; মুসলিম, হাদিস: ৫৫)
৩০. পার্থিব ধনসম্পদ ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ক্ষমতার প্রতি মোহ না থাকা। (সূরা ফাতির, আয়াত: ৫; মুসলিম, হাদিস: ৭,১২৪)

খ. জবান বা স্বীকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত শাখা-প্রশাখাগুলো হলো-

১. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বা তাওহিদের স্বীকৃতি প্রদান করা। (সূরা ফাতির, আয়াত ৩; বুখারি, হাদিস ৯)
২. পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত। (সূরা আনফাল, আয়াত ২)
৩. দ্বীনি জ্ঞানার্জন করা। (সূরা জুমার, আয়াত ৯; বুখারি, হাদিস ৭১)
৪. দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া ও দ্বীনের প্রচার করা। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০; বুখারি, হাদিস: ৫০২৭-২৮)
৫. দোয়া করা। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৬; তিরমিজি, হাদিস ৩৫৭১)
৬. আল্লাহর জিকির করা। (সূরা রাদ, আয়াত ২৮; বুখারি, হাদিস ৬৪০৭)
৭. অনর্থক কথা বলা ও শোনা থেকে বিরত থাকা। (সূরা মুমিনুন, আয়াত ৩)

গ. শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা আমলের সঙ্গে জড়িত শাখা-প্রশাখাগুলো হলো-

১. পবিত্রতা অর্জন। (সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬; মুসলিম, হাদিস : ৪৪১)
২. নিয়মিত নামাজ আদায়। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৪৩; সূরা নিসা, আয়াত : ৭৭)
৩. জাকাত আদায় ও দান-সদকা করা। (সূরা বাইয়িনা, আয়াত : ৫; বুখারি, হাদিস : ২৯)
৪. রমজানের রোজা রাখা। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩; বুখারি, হাদিস : ২১)
৫. হজ পালন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯৭; সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৬)
৬. রমজানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করা। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৫; বুখারি, হাদিস : ২০২৬)
৭. হিজরত করা। (সূরা নাহাল, আয়াত : ৪১)
৮. আল্লাহর নামে মান্নত করলে, তা পূর্ণ করা। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭০)
৯. আল্লাহর নামে বৈধ কসম করলে, তা আদায় করা। (বুখারি, হাদিস : ৬১০৮)
১০. কসম ভঙ্গ করলে, তার কাফফারা আদায় করা। (সূরা মায়িদা, আয়াত : ৮৯)
১১. সতর আবৃত রাখা। (সূরা আরাফ, আয়াত : ২৬; মুসলিম, হাদিস : ৩৩৮)
১২. কোরবানি দেওয়া। (সূরা কাউসার, আয়াত : ২; তিরমিজি, হাদিস : ১৫০৭)
১৩. মৃত ব্যক্তির জানাজা আদায় ও দাফন-কাফন করা। (বুখারি, হাদিস : ১২৪০)
১৪. ঋণ পরিশোধ করার দৃঢ় ইচ্ছা। (বুখারি, হাদিস : ২৩৮৯)
১৫. ধোঁকা না দেওয়া। (মুসলিম, হাদিস : ১০২)
১৬. সত্য সাক্ষ্য গোপন না করা। (সূরা ফুরকান, আয়াত : ৭২; বুখারি, হাদিস : ২৬৫৪)
১৭. সামর্থ্য থাকলে বিয়ে করা। (বুখারি, হাদিস : ৫০৬৬)

১৮. হক আদায়। (মুসলিম, হাদিস : ২৫৮১)
১৯. মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার। (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৩)
২০. সন্তান-সন্ততির সুলালন ও পালন করা। (সুরা তাহরিম, আয়াত : ৬)
২১. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। (সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২২; বুখারি, হাদিস : ২০৬৭)
২২. মনিবের আনুগত্য করা। (মুসলিম, হাদিস : ১৩৩)
২৩. ন্যায়বিচার। (সুরা নিসা, আয়াত : ৫৮; সুরা হুজুরাত, আয়াত : ৯)
২৪. মুসলিম জামাতে शामिल থাকা এবং উম্মতের মাঝে ফাটল সৃষ্টি না করা। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩; মুসলিম, হাদিস : ১৮৪৮)
২৫. মুসলিম খলিফা বা নেতার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। (সুরা নিসা, আয়াত : ৫৯)
২৬. ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা। (সুরা হুজুরাত, আয়াত : ৯; তিরমিজি, হাদিস : ২৫০৯)
২৭. ভালো কাজে সহায়তা করা। (সুরা মায়দা, আয়াত : ২; বুখারি, হাদিস : ২৪৪৪)
২৮. সৎকাজে আদেশ করা ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৮-১১০)
২৯. শরিয়ত প্রবর্তিত শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন করা। (সুরা মায়দা, আয়াত ৩৩-৩৪; সুরা নুর, আয়াত ২)
৩০. প্রয়োজন অনুযায়ী জিহাদ করা। (সুরা হজ, আয়াত : ৭৮)
৩১. আমানত রক্ষা এবং তা সঠিকভাবে আদায় করা। (সুরা নিসা, আয়াত : ৫৮)
৩২. অভাবী ও ঋণগ্রস্তদের ঋণ দেওয়া। (বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৩২৮৫)
৩৩. প্রতিবেশীর হক আদায়। (সুরা নিসা, আয়াত : ৩৬; তিরমিজি, হাদিস : ১৯৪৩)
৩৪. হালালভাবে উপার্জন এবং ভক্ষণ করা। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৭২; সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৫১; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৯২০৩)
৩৫. শরিয়তের বিধান মেনে আয়-ব্যয় সমন্বয় করা। (সুরা ফুরকান, আয়াত : ৬৭)
৩৬. সালাম দেওয়া এবং সালামের উত্তর দেওয়া। (সুরা নিসা, আয়াত : ৮৬)
৩৭. হাঁচিদাতা ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বললে উত্তরে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলা। (বুখারি, হাদিস : ১২৪০; মুসলিম, হাদিস : ২৯৯২)
৩৮. কাউকে কষ্ট না দেওয়া এবং কারও কোনও ক্ষতি না করা। (সুরা আহজাব, আয়াত ৫৮; সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১১)
৩৯. অবৈধ খেলাধুলা ও রং-তামাশা থেকে বেঁচে থাকা। (সুরা জুমআ, আয়াত : ১১)
৪০. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৫৭)

২. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা

একজন মুমিনের উচিত কোরআন মাজিদের নিয়মিত তেলাওয়াত করা। নবীজী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। হাদীস ও সীরাতে কিতাবে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। নামাযে, নামাযের বাইরে, রাতের আঁধারে, দিনের আলোতে সর্বাবস্থায় তিনি তিলাওয়াত করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবীজী এত দীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করতেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮১৯, ২৮২০) রমযান মাসে হযরত জিবরীল আ.-কে নবীজী পূর্ণ কুরআন শোনাতেন এবং জিবরীল আ. থেকেও পূর্ণ কুরআন শুনতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬)

কুরআন কারীমের তিলাওয়াতে রয়েছে বহুবিধ কল্যাণ ও উপকারিতা। জাগতিক, পারলৌকিক, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক। পৃথিবীর বুকে কুরআন কারীম একমাত্র কিতাব, যার তিলাওয়াতে রয়েছে হরফে হরফে নেকী। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-
مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ
وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়ল তার জন্য রয়েছে একটি নেকী। আর একটি নেকী দশ নেকী সমতুল্য। নবীজী বলেন, আমি বলছি না যে, আলিফ লাম মীম- একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। - (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১০)

আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ.
যারা উত্তমরূপে কুরআন পড়বে তারা থাকবে অনুগত সম্মানিত ফিরিশতাদের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যায় এবং কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯৮)

যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে কুরআন কারীমকে নিজের সঙ্গী বানাবে কিয়ামতের দিন কুরআন তাকে ভুলবে না। কিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে কুরআন তাকে সঙ্গ দেবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে। আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.

তোমরা কুরআন পড়। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার 'ছাহিবের' জন্য সুপারিশ করবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৪)

কুরআনের প্রতিটি সূরা, প্রতিটি আয়াত এবং প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতের সওয়াব ও ফযীলতের পাশাপাশি কিছু আয়াত ও সূরার বিশেষ কিছু ফযীলতের কথাও উল্লেখিত হয়েছে হাদীস শরীফে। তন্মধ্যে থেকে কয়েকটি আয়াত ও সূরার ফযীলত এখানে আলোচনা করা হল।

সূরা ফাতিহা

আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা রা. বলেন, আমি একদিন মসজিদে নামায পড়ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন-

لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

তুমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই তোমাকে এমন একটি সূরা শেখাব, যা কুরআন মাজীদে সবচেয়ে মহান সূরা।... এরপর বললেন, (সেটি হল) আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা)। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৪৭৪)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ইমাম যখন বলেন-

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ.

তখন তোমরা ‘আমীন’ বল। (কেননা ফেরেশতারাও তখন আমীন বলে) যার আমীন বলা ফেরেশতাদের বলার সাথে মিলে যাবে তার অতীত জীবনের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৮২, ৬৪০২)

আয়াতুল কুরসী

উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আবুল মুনযিরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল মুনযির, তুমি কি জানো আল্লাহর কিতাবের যে আয়াতগুলো তুমি হিফয করেছ তার মধ্যে কোন্ আয়াত শ্রেষ্ঠ? আবুল মুনযির বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি আবার বললেন, হে আবুল মুনযির, তুমি কি জানো আল্লাহর কিতাবের যে আয়াতগুলো তুমি হিফয করেছ তার মধ্যে কোন্ আয়াত শ্রেষ্ঠ? তখন আমি বললাম-

...اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে চাপড় দিয়ে বললেন, ইলম তোমার জন্য সহজ হোক হে আবুল মুনযির। -(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১০)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে এসেছে, এক আগন্তকের সাথে তার কথোপকথন হল। একপর্যায়ে সে বলল-

إِذَا أُوْتِيَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُصْبِحَ.
তুমি রাতে যখন ঘুমাতে যাবে, আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন হেফাযতকারী ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকবেন। ফলে শয়তান তোমার কাছেও ভিড়তে পারবে না। পুরো ঘটনা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

صَدَقَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ.

সে ছিল (ইবলিস) শয়তান। সে মিথ্যুক হলেও কথা সত্য বলেছে। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১০)

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় ওপরের দিক থেকে দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে তিনি মাথা উঠালেন। তখন জিবরাঈল আ. বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা। আজই প্রথম খোলা হল। আগে কখনো এ দরজা খোলা হয়নি। সেখান থেকে একজন ফেরেশতা নেমে এলেন। তিনি বললেন, এই ফেরেশতা আজকের আগে আর কখনো পৃথিবীতে আসেননি। ফেরেশতা সালাম দিয়ে বললেন-

أَبَشِّرْ بُنُورَيْنِ أُوْتِيَتْهُمَا لَمْ يُؤْتِيَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيَتهُ.

আপনি এমন দুটি আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা শুধু আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আপনার পূর্বে আর কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। আপনি এর যেকোনো হরফ পড়বেন তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেওয়া হবে। -(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৬)

হযরত আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ.

যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পড়বে তার জন্য তা (রাতের আমল হিসেবে এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে) যথেষ্ট হবে। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০০৯)

সূরা কাহফ

আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ.

যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে দাজ্জালের ফেতনা থেকে সে মুক্ত থাকবে। -

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৩২৩)

অন্য বর্ণনায় সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত সম্পর্কে এই ফযীলতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৮৬)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ তিলাওয়াত করবে, তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত একটি নূর বেষ্টন করে রাখবে। - (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩৩৯২; সুনানে কুবরা বাইহাকী, হাদীস ৫৯৯৬)

সূরা ইয়াসীন

জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ قَرَأَ يَسَّ فِي لَيْلَةِ ابْتِغَاءٍ وَجْهِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য রাতের বেলা সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। - (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৫৭৪, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৫৬২)

আতা ইবনে আবী রাবাহ রাহ. বলেন, আমার কাছে এই হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ يَسَّ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قُضِيََتْ حَوَائِجُهُ.

যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে সূরা ইয়া সীন তিলাওয়াত করবে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরা করা হবে। - (সুনানে দারেমী ২/৫৪৯)

সূরা মুলক

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

سُورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً، تَشْفَعُ لَصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে। যে ব্যক্তি নিয়মিত সেই সূরা তিলাওয়াত করবে তার জন্য ক্ষমা আদায় করা পর্যন্ত সূরাটি সুপারিশ করতে থাকবে। সেই সূরা হল, ‘তাবারাকাল্লাযি বিইয়াদিহিল মুলক’। (-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪০০; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮৯১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৮৭)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

مَنْ قَرَأَ تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللَّهُ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَكُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّيهِ الْمَانِعَةَ، وَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ سُورَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ.

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা মুলক পড়বে আল্লাহ তাআলা তাকে এর ওসিলায় কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় এই সূরাকে আমরা বলতাম- ‘মানেআ’ অর্থাৎ কবরের আযাব প্রতিরোধকারী। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে এই সূরা তিলাওয়াত করল সে অনেক তিলাওয়াত করল এবং উত্তম কাজ করল। -(সুনানে কুবরা নাসায়ী, হাদীস ১০৫৪৭; আলমুজামুল কাবীর তবারানী, হাদীস ১০২৫৪; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩৮৩৯)

সূরা ইখলাস

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন-

أَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ.

তোমাদের কেউ কি রাতের বেলা কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে পারবে? বিষয়টি তাঁদের কাছে কঠিন মনে হল। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কে তা পারবে? তখন তিনি বললেন-

اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

অর্থাৎ সূরা ইখলাস কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ (তিলাওয়াতের সমান)। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১৫)

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، نَفَثَ فِي كَفْفِيهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِالْمَعْوَذَتَيْنِ جَمِيعًا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ. قَالَتْ غَائِشَةُ: فَلَمَّا اسْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন বিছানায় আসতেন, (ঘুমানোর আগে) সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে দুই হাতের তালুতে (একত্র করে) ফুঁ দিতেন। এরপর সেই দুই হাতে চেহারা ও পুরো শরীর যতদূর সম্ভব মুছে নিতেন। আয়েশা রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে গেলে আমাকে আদেশ করতেন, আমি তা (সূরাগুলো পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে শরীর মোছার কাজ) করে দিতাম। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৪৮)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে-

يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَظَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

দুই হাতে পুরো শরীর যতদূর সম্ভব মুছে নিতেন। মোছা শুরু করতেন মাথা চেহারা ও শরীরের সম্মুখভাগ থেকে। তিনবার এমন করতেন। - (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১৭)

আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمَعْوَدَتَيْنِ حِينَ تُمَسِّي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস সকাল সন্ধ্যা তিনবার করে পড়লে তা তোমার জন্য সকল সমস্যা ও অনিষ্ট থেকে (রক্ষার ক্ষেত্রে) যথেষ্ট হবে। - (জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৮২)

৩. সর্বদা সত্য কথা বলা, মিথ্যা কখনই না বলা।

সত্যবাদিতার বিপরীত হচ্ছে মিথ্যাচার। যে মিথ্যা বলে সে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। মিথ্যার ফলে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। দমিত্য মানুষকে ইহকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত করে এবং পাপের পথে পরিচালিত করে। আর পাপ তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে। তাই মিথ্যার ধ্বংসাত্মক প্রভাব সুদূর প্রসারী। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মিথ্যার ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

- **মিথ্যা হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত করে :** মিথ্যা মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে গড়মিল সৃষ্টি করে। ফলে মিথ্যাবাদীর আচরণে সততার অভাব ধরা পড়ে। সে সুবিধা আদায়ের জন্য এদিক-সেদিক দৌড়ে বেড়ায় এবং কোনটা হালাল, কোনটা হারাম তা বিচার করে না। সমাজের মানুষ তাকে বিপজ্জনক মনে করে। ঘৃণিত এই স্বভাবের কারণে সে ছিরাতে মুস্তাক্কীম থেকে ছিটকে পড়ে এবং আল্লাহর হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ**, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ (সূরা মুমিন/গাফের ৪০, আয়াত ২৮)।
- **প্রশান্তি বিলুপ্ত ও সন্দেহ সৃষ্টি করে:** মিথ্যা মানুষের মনে সন্দেহ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। মিথ্যাবাদীর অন্তরে সর্বদা অস্থিরতা বিরাজ করে এবং এটি তার মানসিক প্রশান্তি বিদূরিত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ**, ‘যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয় তা পরিত্যাগ করে যাতে সন্দেহ নেই তা গ্রহণ কর। কেননা সত্য হচ্ছে প্রশান্তি আর মিথ্যা হচ্ছে সন্দেহ’। (তিরমিযী, হাদীস ২৫১৮; মিশকাত, হাদীস /২৭৭৩)
- **মিথ্যা মানুষের অন্তরকে সংকুচিত করে ও সর্বদা চিন্তিত রাখে।** এজন্য মিথ্যুক ব্যক্তি সর্বদা পার্থিব জীবনে মানসিক অশান্তি নিয়ে দিনাতিপাত করে। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘মানসিক প্রশান্তিই সবচেয়ে বড় প্রশান্তি এবং মানসিক শান্তিই সবচেয়ে বড় শান্তি’^{২১}
- **অন্তরকে পীড়িত করে :** মিথ্যা মানুষের অন্তরে নিফাক বা কপটতার রোগ জন্ম দেয়। ফলে সমাজে দ্বিমুখী নীতির মানুষ সৃষ্টি হয়। এ ব্যাধি মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এর ক্ষতিকর প্রভাব সুদূর প্রসারী। এটি মানুষের উত্তম গুণাবলী ছিনিয়ে নেয়। তাকে সৎ আমলসমূহ থেকে বঞ্চিত করে এবং তার উন্নত মূল্যবোধগুলো বিদূরিত করে। ফলে এ ধরনের মানুষ প্রকৃত মুমিন হ’তে পারে না। তাদের মিথ্যাচারিতার কারণে তাদের জন্য পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,
- **وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ**-

‘আর লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহ ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা বিশ্বাসী নয়। তারা আল্লাহ ও ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এর দ্বারা তারা কেবল নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনা। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি তাদের মিথ্যাচারের কারণে’ (বাকারা, আয়াত ৮-১০)।

- **রিযিক ও বরকতে ঘাটতি সৃষ্টি করে :** মিথ্যা এমন এক জঘন্য অপরাধ যা মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে। মিথ্যা বলার মাধ্যমে মানুষ সাময়িকভাবে লাভবান হ’তে চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সে সাময়িক কিছু অর্জন করতে পারলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমত হ’তে বঞ্চিত হয়। অনুরূপভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা ও কসম পণ্যের বিক্রি বাড়ালেও তার বরকত কমে যায়। ফলে মিথ্যাবাদী প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এজন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অধ্যায় রচনা করেছেন **الْبَيْعُ وَالْكَيْدُ** ‘মিথ্যা বলা ও দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখায় ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে যায়।’

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا-

‘যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে ও যথাযথ বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত চলে যাবে’। (বুখারী, হাদীস ২০৮২)

তিনি আরো বলেন, **الْخَلِيفُ مُنْفَقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ، مُمَحَقَّةٌ لِلْبَرْكََةِ** ‘মিথ্যা কসম পণ্যের কাটতি বাড়ায় কিন্তু বরকত কমিয়ে দেয়’। (বুখারী, হাদীস ২০৮৭; মিশকাত হাদীস ২৭৯৪)

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা কসম করা থেকে বিরত থাক। কেননা এর কারণে (সাময়িক) পণ্য বেশী বিক্রি হ’লেও বরকত কমে যায়’। (বুখারী হাদীস ৪৫৪৯; মিশকাত হাদীস ৩৭৫৯)

- **মিথ্যা শপথকারী আল্লাহর ক্রোধের পাত্র :** মানুষ যেসকল পাপের দ্বারা দু’জাহানে ক্ষতির অতল তলে নিমজ্জিত হয় তন্মধ্যে মিথ্যা শপথ অন্যতম। এটি কবীরা গুনাহ। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ও অন্যের ক্ষতি করতে তৎপর হয়। এসব ব্যক্তিকে আল্লাহ পরকালে মুক্ত করবেন না। ফলে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির শিকার হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **مَنْ خَلَفَ يَمِينٍ صَبْرٍ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ**

‘যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ঠান্ডামাথায় মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন’। (বুখারী হাদীস ৪৫৪৯; মিশকাত হাদীস ৩৭৫৯)

আবু যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ তা‘আলা ক্রিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে (গুনাহ ক্ষমা করে) পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। একথা শুনে আবু যার (রাঃ) বললেন, তাদের জন্য তো ধ্বংস ও অধঃপতন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তারা কারা? তিনি বললেন, (১) যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় বুলিয়ে পরে (২) যে দান করে খোঁটা দেয় (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম দ্বারা নিজের মাল বিক্রি করে। (মুসলিম, হাদীস ১০৬; মিশকাত, হাদীস ২৭৯৫)

- **মিথ্যা সাক্ষ্যদান কাবীরা গুনাহ:** মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে সমাজে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এর মাধ্যমে অনেক সময় মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়। বর্তমানে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে কত হক্ক যে বিনষ্ট হচ্ছে, কত নির্দোষ-নিরপরাধ মানুষ যে যুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, কত জমি-জায়গার মালিক যে অন্যায়ভাবে তা দখল করেছে তার ইয়ত্তা নেই। মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে নিষেধ করে মহান আল্লাহ বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، ‘অতএব তোমরা মূর্তিপূজার কলুষ এবং মিথ্যা কথা হ’তে দূরে থাক। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করে’ (হজ্জ, আয়াত ৩০-৩১)।

মুমিন বান্দা কখনো এ ধরনের কাজে জড়িত হ’তে পারে না। আল্লাহ মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا- ‘যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয় তখন ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে’ (ফুরকান, আয়াত ৭২)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا أُتَبِّئُكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ،

‘আমি কি তোমাদেরকে বৃহত্তম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? কথাটি তিনি তিনবার বললেন, ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (উত্তরে) তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় কথাগুলি বলছিলেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসে বললেন, শুনে রাখ! আর মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া’। (বুখারী, হাদীস ২৬৫৪, ৫৯৭৬; মুসলিম হাদীস ৮৭)

- **মিথ্যা পাপ ও জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে :** মিথ্যা মানুষকে পাপ ও অন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। আর পাপ তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ

يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ‘আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের পথ বাতলিয়ে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তাকে কায়যাব (চরম মিথ্যুক) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। (মুসলিম হাদীস ২৬০৭; মিশকাত হাদীস ৪৮২৪)

- **মিথ্যা বলা মুনাফিকী :** মিথ্যা বলা মুনাফিকের পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ**, ‘মুনাফিকের আলামত তিনটি। (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে (২) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে (৩) আমানত রাখা হ’লে খেয়ানত করে। (বুখারী, হাদীস ৩৩)

অন্যত্র তিনি বলেন, **أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ** ‘যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক এবং যার মধ্যে তার একটি দেখা যাবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব রয়েছে। যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। (১) তার নিকট আমানত রাখা হ’লে তা খিয়ানত করে (২) কথা বললে মিথ্যা বলে (৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে (৪) ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে’। (বুখারী, হাদীস ৩৪; মুসলিম, হাদীস ৫৮৩)

৪. কখনো প্রত্যারণার আশ্রয় না নেওয়া বরং বিশ্বস্ত এবং আস্থাভাজন হওয়া।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে প্রত্যারণা ও প্রত্যারক, উভয়ের ব্যাপারে কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন এবং তাদের জন্য অবধারিত ধ্বংসের ঘোষণা দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় পবিত্র কালামের এই আয়াতে,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ- الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ- وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা মানুষের থেকে মেপে নেয়ার কালে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদের জন্য মাপে বা ওজন করে, তখন কম দেয়।” (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ১-৩)

এ এক কঠিন ঘোষণা, যারা ঠগবাজি করে, মাপে ও ওজনে মানুষকে কম দেয় তাদের জন্য। সুতরাং যারা পুরোটাই চুরি করে, আত্মসাৎ করে, এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তুতে ঠকায়, তাদের কী কঠিন অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাপে ও ওজনে কমপ্রদানকারীর তুলনায় এরা আল্লাহ তাআলার শাস্তির অধিক ভাগিদার, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আল্লাহর নবী শূয়াইব আ. তার সম্প্রদায়কে মানুষকে তার প্রাপ্য বস্তুতে ঠকানো এবং মাপে ও ওজনে কম প্রদানে সতর্ক করেছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

এমনিভাবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যারণা থেকে সতর্ক করেছেন এবং প্রত্যারকের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের এক স্তুপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি খাবারের স্তুপে হাত প্রবেশ করালেন, তার আঙুলগুলো ভিজে গেল। তাই তিনি বললেন, ‘হে খাবারওয়ালা, এটা কি ? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, তাতে বৃষ্টির পানি পড়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কি তা খাবারের উপরে রাখতে পারলে না, যাতে মানুষ তা দেখে ? যে প্রত্যারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।’ অন্য রেওয়ায়েতে আছে ‘যে আমাদের সাথে প্রত্যারণার আশ্রয় নেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’। অপর রেওয়ায়েতে আছে ‘সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে প্রত্যারণার আশ্রয় নেয়।’ (মুসলিম)

সুতরাং রাসূলের উক্তি ‘আমাদের দলভুক্ত নয়’ প্রত্যারণার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। প্রত্যারণা, প্রত্যারণার নোংরা এলাকায় পা বাড়ানো, তার ভয়াবহ ঘেরাটোপে আটকে পড়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এ উক্তিই আমাদেরকে সরল পথ দেখাবে।

৫. অগোচরে কারো সমালোচনা না করা এবং কারো সম্পর্কে কু-ধারণা বা খারাপ মন্তব্য না করা

একজন ভালো মুসলিম অন্যের অগোচরে তার সমালোচনা বা গীবত করবে না এবং অহেতুক কোনো ধারণা পোষণ করবে না। গিবত/গীবাহ বলা হয় কারো অগোচরে তার এমন দোষ সম্পর্কে আলোচনা করা, যেটা তার মধ্যে বিদ্যমান এবং সে শুনলে কষ্ট পাবে। কোরআন ও হাদিসে এই গোনাহটি সম্পর্কে বহুবার সতর্ক করা হয়েছে। এটা এমন একটি গোনাহ, যার গিবত করা হয়েছে, সে মাফ না করলে মাফ হবে না।

কু-ধারণা হলো, অন্য কারও সম্পর্কে অকারণে খারাপ ধারণা পোষণ করা, যার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। অনেক সময় ঈর্ষা, অহংকার কিংবা শত্রুতার কারণে এ ধরনের কু-ধারণা গড়ে ওঠে। এমন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামে গুরুতর গোনাহর শামিল।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, হে মুমিনগণ! অধিকাংশ ধারণা থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা গোনাহ। (সূরা হুজরাত, আয়াত ১২)। এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে অধিকাংশ ধারণা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ অধিকাংশ অনুমানই মিথ্যা ও পাপের উৎস। কোরআনের এই নির্দেশ মুসলমানদের অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার প্রতি আহ্বান।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা কু-ধারণা হলো সবচেয়ে মিথ্যা কথা। (বুখারি: ৫১৪৩, মুসলিম: ২৫৬৩)। তিনি আরও বলেন, তোমরা একে অপরের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করো না, হিংসা করো না, পশ্চাতে দোষ চর্চা করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও। (মুসলিম: ২৫৬৩)। এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায়, কু-ধারণা শুধু ব্যক্তিগত পাপ নয়, বরং এটি সামাজিকভাবে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক একটি আচরণ।

৬. গুরুত্বপূর্ণ সব কাজে বিজ্ঞজনের পরামর্শ নেওয়া। আর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা।

একজন ভালো মুসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব কাজে, চাই সেটা দ্বীনি কাজ হোক বা দুনিয়াবী কাজ হোক, উক্ত কাজে অভিজ্ঞ এবং মুরুবি লোকদের পরামর্শ গ্রহণ করা। অতঃপর পরামর্শ মোতাবেক যে সিদ্ধান্ত হয় তা বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা। মহান রাব্বুল আলামিন পরামর্শ অনুসারে কাজ করা নিয়ে বলেছেন যে,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“তুমি কাজকর্মে মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করো; অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলো তখন আল্লাহর ওপর ভরসা রেখো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালার তার ওপর ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯)

স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বে ফেরেশতাদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। অথচ আল্লাহর জন্য কারো সাথে পরামর্শ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতা'লা ফেরেশতাদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে তার বান্দাদের এই মেসেজ দিতে চেয়েছেন যে, দেখো আমার বান্দারা, যেখানে তোমার রব, দুনিয়া ও আখিরাতের সৃষ্টিকর্তা তার সামান্য মাখলুকের সাথে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করছেন সেখানে তুমি মাখলুক হয়ে কীভাবে আরেক মাখলুকের সাথে পরামর্শ না করে নিজের মনগড়া কিছু করতে পারো? মাখলুকের সাথে আল্লাহর পরামর্শ থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের জীবনে পরামর্শ করা কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া, ভালো মানুষের সাথে পরামর্শ করা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তা আল্লাহ তা'য়ালার 'পরামর্শ' নামক (সূরা আশ-শূরা) একটি সূরা নাযিল করা থেকেই সহজে অনুমেয়। পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ না হলে অন্তত এই নামে আলাদা কোনো সূরা নাযিল করা হতো না। এই নামে সূরা নাযিল থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যেকোনো বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে নেককার মানুষের পরামর্শ গ্রহণ করা উত্তম।

৭. সব সময় ভালো এবং জনকল্যাণমূলক কাজ নিজে করা এবং অন্যকে তা করার প্রতি উৎসাহিত

করবে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা এবং অন্যকে তা থেকে নিষেধ করা।

একজন ভালো মুসলিমের উচিত সর্বদা নিজেকে ভালো ও জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত রাখা এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা। নিজেও সকল অশ্লীলতা, গর্হিত ও খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং অন্যদেরকেও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজের নিষেধ করা মুসলিমদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ। তিনি বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম।” (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১০৪)।

তিনি আরো বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

‘তোমরাই এমন এক উত্তম দল, যাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; আর যদি গ্রন্থ প্রাপ্তগণ বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে অবশ্যই তাদের জন্যে মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো মুমিন এবং তাদের অধিকাংশই দুষ্কার্যকারী’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

‘মুমিন পুরুষ ও নারী তারা পরস্পরের বন্ধু শুভাকাজী। তারা ভালকাজের আদেশ করে এবং মন্দকাজের নিষেধ করে। তারা আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন মানুষ যাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়’ (সূরা তওবা, আয়াত ৭১)।

যা বুনী অফিম الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
লোকমান হাকীম তার ছেলেকে বলেন, ‘হে আমার পুত্র! ছালাত কায়েম কর, ভালকাজের আদেশ দাও, মন্দকাজের নিষেধ কর। আর যে বিপদই আসুক না কেন তাতে ধৈর্য ধারণ কর। এ কাজগুলি এমন যাতে খুব বেশী বেশী তাকীদ করা হয়েছে’ (সূরা লোকমান, আয়াত ১৭)।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ
جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ‘সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে, যালিম শাসকের নিকটে হক কথার দাওয়াত দেয়া’ (আবুদাউদ, তারগীব হা/৩২৯৯)।

৮. আল্লাহর দ্বীনের কাজে সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করা।

একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা করা। নিজের সময়, শ্রম ও সামর্থ্য দিয়ে আল্লাহর বিধান সমাজে কায়েম করার চেষ্টা করা।

৯. ন্যায়ের পক্ষে সে অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিবে। সত্য ও বাস্তব ব্যাপারে দ্বিধাহীনভাবে নিঃসংকোচে কথা বলবে।

একজন মুসলমানের উচিত ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া।

১০. নিজের চক্ষু, লজ্জাস্থান ও জবানের হেফাজত করা।

একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা করা। নারীপুরুষ নির্বিশেষে নিজের চক্ষু, লজ্জাস্থান ও জবানের হেফাজত করা।

১১. সৎ-সাহসী ও শক্তিশালী হওয়া, কাপুরুষ না হওয়া

১২. নিষ্ঠাবান হওয়া যদিও এতে নিজের ক্ষতি হয়।

১৩. অন্যের অধিকারে কখনো হস্তক্ষেপ না করা।

১৪. নিজের উপর অন্যায় বা জুলুম করলে তা সে মেনে না নেওয়া।

১৫. সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করবে।

১৬. সে হবে বিনয়ী এবং দয়ালু।

১৭. একজন মুসলিম নারীর জন্য হিজাব পরিধান করা এবং পর-পুরুষের সামনে নিজেকে পূর্ণাঙ্গরূপে ঢেকে রাখা।

সর্বশেষ আমরা সূরা হুজরাতে ৯ থেকে ১৩ আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেই একজন মুসলিম ব্যক্তির উন্নত জীবন গঠনের সকল পাথেয় পেয়ে যাব।

পারিবারিক জীবনে কুরআনের বাস্তবায়ন

পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি। পারিবারিক জীবন ব্যতিরেকে মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মানুষের অস্তিত্বের জন্য পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নতি-অগ্রগতি ইত্যাদি সুষ্ঠু পারিবারিক ব্যবস্থার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। সারা দিনের কর্মকলাপ্তি, বিভিন্ন কারণে মানব মনে পাওয়া দুঃখ-বেদনায় যেখানে সবাই শান্তি খোঁজে সেটা হ'ল পরিবার। যদি পরিবারে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে তাহ'লে মানব জীবন সুখময় হয়। পক্ষান্তরে পরিবারে কাঙ্ক্ষিত শান্তি না থাকলে জীবন হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণ, বিষাদময়। পারিবারিক জীবন অশান্ত ও নড়বড়ে হ'লে, তাতে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হ'তে বাধ্য। এজন্য দরকার একটি আদর্শ পরিবার। যা হবে মানুষের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির আকর। বস্তুত, পরিবারই হচ্ছে কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি।

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) ও প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আঃ)-কে কেন্দ্র করে মানব জাতির প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে। এই প্রথম পরিবারের সদস্য স্বামী ও স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেছিলেন,

يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
“হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা চাও খুশীমনে খাও। কিন্তু তোমরা দু'জন এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে” (সুরা বাকারাহ, আয়াত ৩৫)।

এই প্রথম পরিবার থেকে মানব জাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (হাক্ক) চেয়ে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক” (সুরা নিসা, আয়াত ১)।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন,

-يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ’তে পার” (সুরা হুজুরাত, আয়াত ১৩)।

অনুরূপভাবে সকল নবী-রাসূলের ব্যক্তিগত জীবনে ও সময়কালে পরিবার বিদ্যমান ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“তোমার পূর্বেও আমরা অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি।” (সুরা রা’দ, আয়াত ৩৮)।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা

একটি শিশুর জীবন শুরু হয় তার পিতা-মাতার মাধ্যমে। এই পৃথিবীতে পিতা-মাতাই হচ্ছে সন্তানের সবচেয়ে বড় আপন জন। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর পিতা-মাতাই পরম মমতা ও আদর যত্ন ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে সন্তানকে বড় করে তোলেন। বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের পর পিতা মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি” (সুরা আনকাবুত, আয়াত ৮)।

মহান আল্লাহর ইবাদত করা যেমনি ফরজ, পিতা-মাতার খেদমত করা মানুষের ওপর তেমনি ফরজ। ইরশাদ হচ্ছে-

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“এবং আপনার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাঁদের কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন তা হলে তাঁদের সঙ্গে “উহ” শব্দটিও বলোনা। তাদের ধমক ও দিয়ো না। তাদের সঙ্গে শিষ্টতাপূর্ণ কথা বলো। তাদের সামনে ভালোবাসার সঙ্গে বিনম্র ভাবে মাথানত করে দাও এবং বলো হে পালন কর্তা তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেমনটি তাঁরা আমাদের শৈশব কালে করেছেন”। (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ২৩- ২৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে কুরতুবীতে লেখেন - আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতের মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি আদব, সম্মান এবং তাঁদের প্রতি সদ্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সঙ্গে একত্রিত করে ফরজ করেছেন। যেমন সুরা লোকমানের মধ্যে মহান আল্লাহ নিজের শুকরিয়া আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করাকে ও বান্দার ওপর একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। এখানে পিতা-মাতার বার্ষক্যে উপনীত হওয়ার বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তাদেরকে ‘উহ’ বলবে না, এখানে ‘উহ’ শব্দটি বলতে বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পীড়া দানের ক্ষেত্রে ‘উহ’ বলার চাইতে কম কোন স্তর থাকলে তাও অবশ্যই উল্লেখ করা হত। পিতা-মাতার সঙ্গে ধমক দিয়ে কথা বলা নিষেধ। তাদের সাথে সমপ্রীতি ও ভালবাসার সাথে নরম স্বরে কথা বলতে হবে।

পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচারনের বিষয়টি হাদিস শরীফে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। সীমাহীন ফজিলত ও সাওয়াবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ‘সে দুর্ভাগা! সে দুর্ভাগা!! সে দুর্ভাগা!!! উপস্থিত সাহাবিগণ আরজ করলেন, সে কে? উত্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন বললেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতা উভয়কে অথবা যে কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না’ (মুসলিম শরীফ: ৬৬৭৫)। একদা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন বললেন, আমি যখন মিসরের তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখেছি তখন জিব্রাইল (আ:) এসে বললেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়ে তাদের সেবা করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না, সে ধ্বংস হউক। তখন আমি বললাম আমিন (সুনানে তিরমিজী শরীফ: ৩৫৪৫)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? তিনি বলেনঃ ওয়াক্তমত নামায পড়া। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদাচার। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। রাবী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি আরো জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্যই আমাকে আরো বলতেন (বুখারী, মুসলিম, দারেমী, তিরমিযী, নাসাঈ)।

সন্তানের উপর পিতা-মাতার ১৪ টি অধিকার রয়েছে। তার মধ্যে ৭টি জীবিত কালে। যথা- তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, ভালবাসা প্রকাশ করা, তাদের সেবা করা, আনুগত্য করা, সুখ-শান্তির চিন্তা করা, প্রয়োজন পূরণ করা ও তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করা। আর ৭টি মৃত্যুর পর। যথা- তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা, তাদের ঋণ পরিশোধ করা, তাদের রেখে যাওয়া আমানত পরিশোধ করা, তাদের বৈধ অসিয়ত পূরণ করা, তাদের বন্ধু ও স্বজনদের সম্মান করা, তাদের বন্ধু ও স্বজনদের সহযোগীতা করা ও মাঝে মাঝে তাদের কবর জিয়ারত করা।

পিতা-মাতা কাফের হলেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ও তাদের সেবা করা জরুরী। পাপাচার ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার অনুগত থাকার নির্দেশনা রয়েছে। যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ যায়েজ নয়। কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রেখে চলতে হবে।

স্বামী স্ত্রী হিসেবে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব

মা বাবার মাধ্যমে দুনিয়াতে আসলেও স্বাভাবিকভাবেই মানুষের সবচেয়ে বেশি সময় কাটে স্বামী বা স্ত্রীর সাথে। মানুষের জীবনে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী হলো তার স্বামী বা স্ত্রী। সুখে-দুঃখে, বিপদে- আপদে, ঘরে- সফরে বিবাহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন স্বামী বা স্ত্রী সর্বদা নিজেকে পরস্পরের সেবায় নিয়োজিত রাখেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে পরস্পরের পোশাকের সাথে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“স্ত্রীগণ তোমাদের পোশাকস্বরূপ আর তোমরা স্ত্রীদের পোশাকস্বরূপ।” (সূরা বাকারা-১৮৭)

অর্থাৎ পোশাক যেমন শরীরের সাথে লেগে থাকে তেমনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য এবং সর্বদা লেগে থাকার। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন স্বামীদের প্রেমাপ্পদ হিসেবে, স্বামীদের শান্তি অর্জনের জন্য। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হল; তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা রুম, আয়াত ২১)

পারিবারিক জীবনে সুখ, শান্তি ও কল্যাণ পেতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভালোবাসা প্রয়োজন। তাদের সম্পর্ক যত উত্তম ও মধুর হবে, দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তি তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীর বিশেষ দায়িত্ব ও হক রয়েছে। এখানে তেমনই কয়েকটি হক ও দায়িত্বের কথা তুলে ধরা হলো:

স্বামীর ওপর স্ত্রীর হকসমূহ

১. স্ত্রীর সাথে সর্বদা ভালো আচরণ (সদ্ব্যবহার) করা।

একজন স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সাথে নম্র আচরণ করা এবং তাকে খুশি রাখা, স্ত্রীর ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা স্বামীর কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

অর্থ: তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ কর। (সূরা নিসা, আয়াত ১৯)

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

অর্থ: মুমিনদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৬২)

এ ধরনের আরো অনেক বর্ণনা হাদীসগ্ৰন্থে রয়েছে যেখানে স্ত্রীর কাছে ভালো হওয়া পুরুষের জন্য প্রকৃতার্থে ভালো হওয়ার মানদণ্ড নির্ণয় করা হয়েছে। কারণ স্বামীর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্ববিষয় অন্যের কাছে গোপন থাকলেও স্ত্রীর কাছে তা স্পষ্ট থাকে। তাই স্বামী বাস্তবে ভালো না হলে অন্যের দৃষ্টিতে যত ভালোই হোক স্ত্রীর কাছ থেকে ভালো হওয়ার সার্টিফিকেট কখনোই পাবে না।

অনেকে এমন আছে বাইরে বেজায় ভদ্রলোক, কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে ভদ্রতার কোন তোয়াক্কা করে না। সামান্য ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে, গালমন্দ করে, আবার অনেকে তাদের গায়ে হাত তোলে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রহার করতে নিষেধ করে বলেন,

لا تضربوا إماء الله

“তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে প্রহার করো না।” (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২১৪৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিন কোন বিবি কিংবা চাকর-নওকরকে প্রহার করেননি। আর যারা স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে তাদেরকে অভদ্র বলেছেন। স্ত্রীর বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পরিবারে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য শরীয়তে স্বামীকে হালকা প্রহারের অনুমতি দেয়া হলেও তার সীমারেখাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

২. সামর্থ্যানুযায়ী স্ত্রীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা ও খোরপোষ দেওয়া।

মুসলিম স্বামীদের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রী ও নাবালেগ সন্তানের ভরণ-পোষণ দেওয়া আবশ্যিক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ * وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মাদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোন মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোন বাবাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিশের উপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ فَلَهُ الْآخَرَىٰ ۚ

“(ইদতকালে) নারীদেরকে সেভাবেই বসবাস করতে দাও যেভাবে তোমরা বসবাস কর তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য তাদেরকে জ্বালাতন করো না। তারা যদি গর্ভবতী হয়ে থাকে, তবে তারা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন কর। অতঃপর তারা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দাও। (দুধ পান করানোর ব্যাপারে) ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে লও। আর (দুধ পান করানোর ব্যাপার নিয়ে) তোমরা যদি একে অপরের প্রতি কড়াকড়ি করতেই থাক, তাহলে (এ অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য) অপর কোন স্ত্রীলোক সন্তানকে দুধ পান করাবে।” (সূরা তলাক, আয়াত ৬)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ - وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِفْ بِمِمَّا آتَاهُ اللَّهُ - لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا - سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে ব্যয় করবে। আর যার রিয়ক সীমিত করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর আরাম দিবেন।” (সূরা তলাক, আয়াত ৭)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের জন্য হালাল করেছ। ...তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তোমাদের ওপর। তোমরা তা স্বাভাবিকভাবে আদায় করবে।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১৯০৫)

৩. স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেওয়া এবং আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত রাখা

স্বামীর উচিত তার স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেওয়া বিশেষত ঈমান-আকায়েদ, মুয়ামেলাত, মুয়াশেরাত, আমলসমূহ যেমন নামাজ, রোজা ও অন্যান্য আমল প্রয়োজনীয় দ্বীনি যেমন এলেম হয়েয-নেফাসের মাসআলাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া, দ্বীনের আহকাম মেনে চলার জন্য উৎসাহ দিতে থাকা, আল্লাহর নাফরমানি অর্থাৎ শরীয়ত পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখা।

৪. স্ত্রীর অন্যান্য হকসমূহ:

- স্ত্রীর কোনো কথায় বা কাজে কষ্ট পেলে ধৈর্য্য ধারণ করা।
- উচ্ছৃঙ্খল, বেপর্দা চলাফেরা করতে থাকলে নম্র ভাষায় তাকে বোঝানো।
- সামান্য বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা। কথায় কথায় ধমক না দেওয়া। রাগ না করা।
- মাঝে মাঝে স্ত্রীর নিকটাত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাত করার সুযোগ করে দেওয়া।
- চাহিদানুযায়ী স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা। একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা।
- অনুমতি ব্যতীত আয়ল অর্থাৎ মেলামেশার সময় শেষ মুহূর্তে স্বাভাবিক স্থান ত্যাগ না করা।
- স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ও অন্যান্য গোপন বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ না করা।
- স্ত্রীর আত্মমর্যাদায় আঘাত করে এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।
- শুধু শুধু স্ত্রীর প্রতিসন্দেহ এবং কুধারণা না করা।
- প্রয়োজনে স্ত্রীকে সতর্ক করা, শাসন করা। শরীয়ত অনুমোদিত সীমারেখার বাইরে শাসন না করা।
- সম্প্রতি বজায় রেখে চলার চেষ্টা করা, একান্ত নিরুপায় না হলে তালাক না দেওয়া এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শরীয়ত-গৃহীত পন্থায় তালাক দেওয়া।

স্ত্রীর ওপর স্বামীর হকসমূহ

১. স্বামীকে যথাযথ সম্মান করা:

স্বামীকে যথাযথ সম্মান করা স্ত্রীর দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমি যদি (আল্লাহ ছাড়া) অন্য কাউকে সিজদা করার হুকুম দিতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার হুকুম দিতাম।’ (তিরমিজি: ১১৫৯) একজন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও সম্মান কেমন হবে তা এ হাদিসের মাধ্যমেই বুঝা যায়।

২. শরীয়তসম্মত প্রত্যেক কাজে স্বামীর আনুগত্য করা।

শরীয়তসম্মত প্রত্যেক কাজে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

“নারী যদি তার পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রমযান মাসের সিয়াম রাখে, স্বীয় লজ্জাস্থান হিফায়ত করে এবং নিজ স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে”।^{২২}

৩. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه

“কোনো নারীর পক্ষে বৈধ নয় স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ব্যতীত সিয়াম রাখা এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে প্রবেশাধিকার দেওয়া।” (বুখারী, হাদীস নং ৪৮৯৯; মুসলিম, হাদীস নং ১০২৬)

৪. স্বামীর আমানত হিসেবে স্বীয় ইজ্জত-আব্রু ও স্বামীর সম্পদের হেফাযত করা।

স্বামীর উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে স্ত্রী দায়িত্ব হল নিজের ইজ্জত-আব্রু, স্বামীর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির হেফাযত করা। আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল (রক্ষণাবেক্ষণকারী),.... আর নারী তার স্বামীর ঘর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, আর তাকে তার দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে: “নারী তার স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, আর তাকে তাদের ব্যাপারে তার দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” (বুখারী, হাদীস নং ২৩৮৬)

৫. অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া।

মুসলিম নারী বা স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাহিরে যাওয়া বৈধ নয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আর স্ত্রী, স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজ ঘর থেকে বের হবে না। যদি সে এমনটি করে তবে আসমানের ফেরেশতা, রহমতের ফেরেশতা এবং আজাবের ফেরেশতাগণ তার ফিরে না আসা পর্যন্ত তার প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকেন।’^{২২} প্রসিদ্ধ ইফকের ঘটনায় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে এই জঘন্য অপবাদ সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম-

أَتَأْذُنُنِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ

“হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন?” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৮৩৫)

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন, ‘আয়েশা রাযি.-এর এ কথা থেকে বুঝা গেল যে, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার পিতামাতার বাড়িতে যাবে না।’^{২৩}

স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার বাসা থেকে বের হওয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। কিন্তু অনেক সময় স্বামীর বাড়িতে না থাকলে পাশের বাসা অথবা কাছের মার্কেটে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর উচিৎ, স্বামীর নিকট থেকে আম অনুমতি নিয়ে রাখা। অতঃপর শরয়ী আদবের সাথে নিজের বা ছেলেমেয়ের প্রয়োজনে বাইরে কোথাও গেলে কোন ক্ষতি হবে না ইন শাআল্লাহ।

৬. স্বামীর অন্যান্য হকসমূহ:

- সর্বদা স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করা। স্বামীর সাথে অসংযত আচরণ না করা। স্বামীকে কষ্ট না দেওয়া।
- গুনাহ এবং শরীয়ত বিরোধী কাজে অপারগতা তুলে ধরা এবং স্বামীকে নরম ভাষায় বোঝানো। স্বামীকে কোনো গুনাহের কাজ করতে দেখলে আদবের সাথে তাকে বিরত রাখা।
- প্রয়োজনাতিরিক্ত ভরণ-পোষণ দাবি না করা।
- পরপুরুষের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক না রাখা।
- স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে অতিরিক্ত নফল নামায়ে মশগুল না থাকা। অতিরিক্ত নফল রোযা না রাখা।
- স্বামী মেলামেশার জন্য আহ্বান করলে শরীয়তসম্মত কোনো ওয়র না থাকলে আপত্তি না করা।
- স্বামীর আমানত হিসেবে নিজের ইজ্জত-আব্রু ও সম্পদের কোনো ধরনের খেয়ানত না করা।
- সন্তানদের লালন-পালনে অবহেলা না করা।
- দরিদ্র কিংবা অসুন্দর হওয়ার কারণে স্বামীকে তুচ্ছ না করা।
- স্বামীর নাম ধরে না ডাকা। অন্য কারো কাছে স্বামীর বদনাম, দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা।
- শ্বশুর-শাশুড়িকে সম্মানের পাত্র মনে করা। তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা। ঝগড়া-বিবাদ কিংবা অন্য কোনো উপায়ে তাদের মনে কষ্ট না দেওয়া।

পিতা-মাতা হিসেবে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যেখানে পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন পিতা-মাতার সন্তানের ওপর হক রয়েছে, তেমনি সন্তানদের প্রতিও পিতা-মাতার কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে, যেগুলো কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে ন্যায়ের পথ দেখিয়েছে। যেখানে পিতা-মাতার মর্যাদা আল্লাহর পরেই, ঠিক সেখানেই সন্তানের প্রতিও পিতা-মাতার বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ইসলাম সন্তানকে শুধু জীবনের একটি অংশ হিসেবে দেখে না, বরং তাদের হক আদায় করাকে ঈমান, ইবাদত ও আখিরাতের সফলতার শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

আল্লাহ রাসূল আলামিন কোরআনে বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তার অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়। (সূরা তাহরীম ৬)

উপরোক্ত আয়াতের পরিবারবর্গের মধ্যে স্বামী বা স্ত্রীর পরেই দ্বিতীয় পর্যায়ের আসে সন্তানদের কথা। সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করা বাবা-মার দায়িত্ব। সন্তান দীন শিক্ষা না দিলে বাবা-মারই ক্ষতি। মৃত্যুর পর তারা কবরেও সন্তানের গুনাহের জন্য শাস্তি পেতে থাকবে। তাই সন্তানকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, যেন মৃত্যুর পর তার ভালো কাজগুলোর জন্য মা-বাবাও সওয়াবের ভাগীদার হয়। সেজন্য তাদের উপর সন্তানের কী কী হক ও দায়দায়িত্ব রয়েছে ও সন্তানের সাথে তাদের আচারব্যবহার কেমন হতে হবে।

কুরআনের আলোকে পিতা-মাতার হিসেবে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১. সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া:

হযরত লোকমান আলাইহিস সালাম নিজ সন্তানকে যেসব নসিহত করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো তিনি আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলার এরশাদ ফরমান

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, ‘প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলম।’” (সুরা লুকমান, আয়াত ১৩)

২. সন্তানকে দ্বীনের অন্যান্য জরুরি বিষয় শিক্ষা দেওয়া:

হযরত লোকমান আলাইহিস সালাম এর নসিহত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার এরশাদ ফরমান

يَبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ

“হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ।” (সুরা লুকমান, আয়াত ১৭)

৩. সন্তানকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া:

وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ।” (সুরা লুকমান, আয়াত ১৮-১৯)

৪. সন্তানের জন্য দুআ করা:

আল-কুরআনে - অনেক নবী তার সন্তানের জন্য দোয়া করেছেন। যেমন, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এর দোয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

هَذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

সেখানে যাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করেছিল, সে বলল, ‘হে আমার রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৮)

অন্যত্র নেক লোকদের দোয়া সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“আর যারা বলে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।” (সুরা ফুরকান, আয়াত ৭৪)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরিবারের জন্য বিশেষভাবে সন্তান ও বংশধরদের জন্য দো‘আ করেছিলেন,

-رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হ’তেও আপনার অনুগত একটা দল সৃষ্টি করুন। আর আপনি আমাদেরকে আমাদের হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি বাতলে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াময়।” (সুরা বাক্বারাহ, আয়াত ১২৮)।

৫. কন্যা সন্তানের জন্য মনস্কুণ না হওয়া:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

“যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে থাকে।” (সুরা নাহল, আয়াত ৫৮)

৬. দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা না করা:

দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করা হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“দারিদ্র্যের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ।” (সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৩১)

অন্যত্র এরশাদ করেছেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো। প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না। আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায় সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না। তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করবো।” (সূরা আনয়াম, আয়াত ১৫১)

৭. সন্তানের পিতৃ পরিচয়ে বংশ পরিচয় নির্ধারিত হবে:

মানুষের বংশধারা রক্ষা ইসলামী শরিয়তের প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর একটি। আর বংশধারা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো শিশুর পিতৃপরিচয় নির্ধারণ করা এবং তাকে নিষ্কলুষ রাখা। কেননা বংশধারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ বলেন,

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো। এটি আল্লাহর কাছে বেশী ন্যায়সংগত কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু। না জেনে যে কথা তোমরা বলো সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তোমরা অন্তরে যে সংকল্প করো সেজন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময়।” (সূরা আহযাব, আয়াত ৫)

হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার হিসেবে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া:

সন্তান ছেলে হোক মেয়ে হোক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া। আজান সংশ্লিষ্ট হাদিসটি হল-

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবু রাফি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমাহ (রা.) যখন আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান (রা.)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে সালাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ ৫১০৫)

২. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহনিয়া করানো:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي بِالصَّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَاتِ زَادَ يُوسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَاتِ

আয়িশাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বাচ্চাদেরকে আনা হলে তিনি তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন। ইউসুফের বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। এতে বরকতের জন্য কথাটি উল্লেখ নেই। (আবু দাউদ ৫১০৬)

৩. সন্তানের সুন্দর নাম রাখা:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

আবু দারদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে, তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো। (আবু দাউদ ৪৯৪৮)

যে সমস্ত নাম রাখা উত্তম:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

ইবনু উমার (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহামহিম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রাহমান। (আবু দাউদ ৪৯৪৯)

عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجَشْمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ، وَهَمَامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَزْبٌ وَمُرَّةٌ

আবু ওয়াহব আল-জিশামী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ করো। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রাহমান। নামের মাঝে হারিস ও হাম্মাম হলো বিশ্বস্ত নাম এবং হারব ও মুররাহ হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম। (আবু দাউদ ৪৯৫০)

যে সকল নাম রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَاحٌ وَيَسَارٌ وَنَافِعٌ.

সামুরাহ ইবনু জুনদাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চারটি নাম রাখতে নিষেধ করেছেন: আফলাহ, রাবাহ, ইয়াসার ও নারিফ। (মুসলিম ২১৩৬)

৪. সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা করা:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

সামুরাহ ইবনু জুনদাব (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক সন্তান স্বীয় আকীকার সাথে আবদ্ধ। তার পক্ষ হতে তা তার জন্মের সপ্তম দিনে যবেহ করতে হবে। সেদিন তার মাথা মুগুন করতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে। (নাসাঈ ৪২২১)

৫. সন্তানের পক্ষ থেকে সদাকাহ করা:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ اخْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فَضَّةً. قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ .

আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়। (তিরমিজি ১৫১৯)

৬. সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ أَحْفَظَ اللَّهُ يَحْفَظْكَ أَحْفَظَ اللَّهُ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ " .

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ তাআলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ তাআলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উন্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল ক্ষতিই করতে সক্ষম

হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। (তিরমিজি ২৫১৬)

৭. সন্তানকে নামাজের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

আমর ইবনু শুআয়েব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে। (আবু দাউদ ৪৯৫)

৮. সন্তানকে ভালোবাসা, আদর-স্নেহ করা, চুমু দেয়া ও আলিঙ্গন করা:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا . فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا . فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ " مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمْ " .

আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হাসান ইবনু আলীকে চুম্বন করেন। সে সময় তাঁর নিকট আকরা ইবনু হাবিস তামীমী উপবিষ্ট ছিলেন। আকরা ইবনু হাবিস বললেনঃ আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পানে তাকালেন, অতঃপর বললেনঃ যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না। (বুখারী ৫৯৯৭)

৯. সন্তানের লালন পালনের জন্য খরচ করা:

، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرِ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكِيهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِي. قَالَ " نَعَمْ لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ " .

উম্মু সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালামাহর সন্তানদের জন্য ব্যয় করলে তাতে আমার কোন সাওয়াব হবে কি? আমি তাদের এ (অভাবী) অবস্থায় ত্যাগ করতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য যা খরচ করবে তাতে তোমার সাওয়াব আছে। (বুখারী ৫৩৬৯)

১০. সন্তানদেরকে স্বাবলম্বী করে রেখে যাওয়া:

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلَاثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ غَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَأَنْتَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجِزْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ارْذَدَّتْ بِهِ دَرَجَةٌ وَرِفْعَةٌ ثُمَّ

لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ
لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ يَزِيهِ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَاتَ بِمَكَّةَ

সাদ ইবনু আবু ওয়াসলাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আসতেন। একদা আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। একমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার নিবেদন করলাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদেরকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের হতে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক আমল করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তাছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সাদ ইবনু খাওলার জন্য (এ বলে) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। (বুখারী ১২৯৫)

১১. সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لِأَنَّ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ " .

জাবির ইবনু সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিজের সন্তানকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া এক সা পরিমাণ বস্ত্র দান-খাইরাত করার চেয়েও উত্তম। (তিরমিজি ১৯৫১)

১২. সন্তানের খাতনা করা:

ছেলেদের খাতনা করানো একটি অন্যতম সুন্নাত। হযরত জাবির রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সপ্তম দিবসে আকিকা আর খাতনা করিয়েছেন। (আল-মুজামুল আওসাত ৬৭০৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْفِطْرَةُ خَمْسُ الْخِثَّانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأُظْفَارِ، وَنَقْصُ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأُظْفَارِ " .

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের স্বভাবগত বিষয় হলো পাঁচটিঃ খাতনা করা, নাভির নীচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, গোঁফ ছাঁটা এবং (অতিরিক্ত) নখ কাটা। (সহিহ বুখারি ৫৮৮৯, আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৪৭)

১৩. সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়ম করা:

কুরআন ও হাদীসে সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ করার ব্যাপারে জোড় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

عَنْ غَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

আমির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নুমান ইবনু বাশীর (রা.) কে মিসরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। (বুখারী ২৫৮৭)

১৪. বিয়ে উপযোগী বয়সে সম্মানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতামাতাকে উদ্দেশ্য করে গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের সন্তানদের সাবালক হয়ে গেলে বিবাহ করিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُخْسِنِ اسْمَهُ وَأَدِّبْهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيَرْوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يَرْوِّجْهُ فَأَصَابَ إِنْثِمًا فَإِنَّمَا إِيَّاهُ عَلَى أَبِيهِ
তোমাদের মাঝে যার কোন (পুত্র বা কন্যা) সন্তান জন্ম হয় সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব কায়দা শিক্ষা দেয়; যখন সে বালগে অর্থাৎ সাবালক/সাবালিকা হয়, তখন যেন তার বিয়ে দেয়; যদি সে বালগে হয় এবং তার বিয়ে না দেয় তাহলে, সে কোন পাপ করলে উক্ত পাপের দায়ভার তার পিতার উপর বর্তাবে।^{২৪}

ইসলাম সন্তানের অধিকারকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, পিতা-মাতা যদি যথাযথভাবে তা পালন না করে, তবে তারা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে। সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন শুধু একটি পারিবারিক বা সামাজিক বিষয় নয়, এটি একটি ইবাদত ও আখিরাতে জবাবদিহিমূলক আমানত।

আমাদের উচিত পারিবারিক বন্ধন এবং সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বজায় রাখা, তাদের জন্য দুআ করা।

সামাজিক জীবনে কুরআনের বাস্তবায়ন

মহান আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমে সুষ্ঠু-সুন্দর সমাজ কাঠামোর রূপরেখা পেশ করেছেন। শান্তিময় সমাজজীবনের পরিপন্থী যাবতীয় অন্যায় থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। অপরদিকে, সমাজের সকলের প্রতি এবং সবস্তরে ইনসারফ, সমতা, অধিকার আদায়ের ব্যাপারে কুরআন মাজিদের কঠোর দিক নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, “আত্মীয় প্রতিবেশী ও দূর সম্পর্কীয় প্রতিবেশীর হক আদায় কর।” (সূরা নিসা, আয়াত ৩৬)

জাতি, গোত্র, বংশগত মর্যাদা ও আভিজাত্য দিয়ে গৌরব অহংকার ও গালাগালি করা, অন্যের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা, অন্যদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারাদি জানার চেষ্টা করা, গিবত করা ইত্যাদি শিষ্টাচার বিরোধী মন্দ কাজ সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। এসব কাজকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। সেজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “সমস্ত মানুষ একই মূল থেকে উৎসারিত, একই বংশ থেকে উদ্ভূত। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও শ্রেণিতে তাদের বিভক্ত হয়ে পড়া কেবল পারস্পরিক পরিচিতির জন্য। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।” (সূরা হুজরাত, আয়াত ১৩)

জীব হিসাবে মানুষকে জানতে হবে যে, শান্তিপূর্ণ সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে ইসলামের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। যেমন,

- ❖ সকল মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, যদিও নিকটাত্মীয় হয় (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৮; সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৩৫)। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে এক বৈপ্লবিক ও আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হন।
- ❖ প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান ও দয়া প্রদর্শন করা (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৬৩)। আবু উমামা আল-বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন দেখলেন, খারেজী মতাদর্শের প্রায় সত্তরজন লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তাদের মাথা দামেস্কের মসজিদের সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তখন তিনি বললেন, শয়তান এদেরকে কোথায় নিয়ে গেল! এরপর তিনি কাঁদলেন। তখন লোকেরা বলল, আপনি এদের মত মানুষের জন্য কাঁদছেন? তখন তিনি বললেন, ‘কেন কাঁদব না? তারাতো আগে ইসলামের অনুসারী ছিল’।
- ❖ সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজের নিষেধ করা; এটি ইসলামী দাওয়াতের মৌলিক স্তম্ভ এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১০৪)।
- ❖ জবাবদিহিতা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘প্রত্যেক মানুষ দায়িত্বশীল। সুতরাং তার সেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে’।
- ❖ আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ঈমানের অধিকতর নিরাপদ বন্ধন হল আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা’।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কুরআনের বাস্তবায়ন

মানবজীবনে অর্থ-সম্পদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সাধারণত খাদ্য-বাসস্থান ছাড়াও একজন মুসলমানের নামাজ আদায়ের জন্যও অতি প্রয়োজন কিছু অর্থের। কারণ সতর ঢাকার জন্য কাপড়, অজু-গোসলের জন্য পানি তো তাকে কিনতেই হবে। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমরনীতি প্রভৃতি পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থের বিকল্প নেই। তাই প্রচলিত অর্থনীতিগুলোকে কুরআনের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের পূর্বে দেখা উচিত অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে আল কুরআন কী বলে? মহাগ্রন্থ আল-কুরআন গবেষণা করলে আমরা দেখতে পাব, অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা সবসময়ই ইতিবাচক। পবিত্র কুরআনে সম্পদকে ‘খাইর’ (উত্তম) বলা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-‘তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, তোমরা যে (খাইর) সম্পদ ব্যয় কর তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য (ব্যয় করবে)। আর তোমরা কল্যাণকর যে কাজই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত’ (সূরা বাকারা, আয়াত-২১৫)। উক্ত আয়াতে সম্পদের দুটি দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। (১) অর্থ উপার্জন ও (২) তার ব্যয় ব্যবস্থাপনা। উক্ত আয়াতে উল্লেখিত ‘খাইর’-এর শাব্দিক অর্থই হল ভালো। আল্লাহপাক মুমিনের সম্পদকে ‘খাইর’ তথা উত্তম ও ভালো আখ্যা দিয়েছেন সঙ্গত কারণেই। কারণ মুমিন যা উপার্জন করবে তা তো উত্তমই হবে। সে তো মন্দ কামাই করবে না। অন্য আয়াতে সম্পদকে ‘ফদল’ (অনুগ্রহ) বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, ‘তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহের (সম্পদের) সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে’ (সূরা মুজাম্মিল : আয়াত-২০)। এ সম্পর্কে আরও ইরশাদ হচ্ছে, ‘সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (সম্পদ) অন্বেষণ করবে’ (সূরা জুমুআ, আয়াত-১০)।

এর বিপরীতে অর্থ-সম্পদকে কুরআনে ‘কানজ’ (অনুমোদনহীন রিজার্ভ)ও বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, ‘যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও’ (সূরা তাওবা : আয়াত-৩৪)। উক্ত আয়াত নাজিল হলে সাহাবায়ে কেরামগণ ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ স্বর্ণ ও রৌপ্য কিছু না কিছু অনেকের কাছেই আছে। হযরত ওমর (রা.) রাসূল (সা.)-এর দরবারে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা.) জবাবে বললেন, যে মালের যাকাত দেওয়া হয় না সেটাই হল ‘কানজ’। পক্ষান্তরে যে সম্পদের যাকাত দেওয়া হয়েছে সেটা ‘কানজ’ নয়। এতে বোঝা যায়, এখানে ‘কানজ’ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা কারুণ্যের সম্পদকে ‘কানজ’ বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, ‘আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল’ (সূরা কাসাস, আয়াত-৭৬)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সঠিক পন্থায় আয় হলে এবং যথাযথ পন্থায় ব্যয় হলে কুরআনের দৃষ্টিতে অর্থ-সম্পদ অবশ্যই কল্যাণকর। তবে সঠিক পন্থায় উপার্জন ও ব্যয় না হলে সে সম্পদের মালিকের ভয়াবহ পরিণতির কথাও পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে। কুরআনে সম্পদের ক্ষেত্রে ‘ফিতনা’ শব্দের ব্যবহারও হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, ‘জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক ফিতনা বা পরীক্ষা’ (সূরা আনফাল : আয়াত-২৮)। আল্লাহপাক বিনা শর্তে কাউকে সম্পদ দেন না : বরং এ সম্পদ দিয়ে তিনি পরীক্ষা নেন। যাকে তিনি সম্পদ দেন তাকে কিছু দায়-দায়িত্বও দেন। ‘ফিতনা’-এর অর্থ এই নয় যে, বান্দা কোনো সম্পদ উপার্জন করতে পারবে না : বরং সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের পরীক্ষায় সে যেন উত্তীর্ণ হয় সেদিকেই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অর্থ-সম্পদ উপার্জনের মৌলিক ও স্বীকৃত পন্থা

কৃষি খাত

অর্থ-সম্পদ উপার্জনের মৌলিক ও স্বীকৃত যেসব পন্থা রয়েছে এর সবগুলোর আলোচনাই পবিত্র কুরআনে রয়েছে। যেমন, মানবজীবনের জন্য সবচেয়ে অপরিহার্য কৃষি খাতের কথা পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বিভিন্নভাবে বহু জায়গায় আলোচনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, ‘তোমরা যা বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কী? তোমরা কী তা উৎপন্ন কর, না আমি তা ফলাই’ (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত ৬৩-৬৪)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, ‘তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন’ (সূরা হুদ, আয়াত-৬১)। উক্ত আয়াতে ‘ইসতা’মারাকুম ফিহা’ অর্থ জমি আবাদ করা। ইমাম জাসসাস (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘এ আয়াত দ্বারা কৃষি, ক্ষেত-খামার, বৃক্ষ রোপণ এবং ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য জমি আবাদ করা যে আবশ্যকীয় দায়িত্ব সে বিষয়টি সুস্পষ্ট’ (আহকামুল কুরআন)। উক্ত আয়াতে কৃষি থেকে শুরু করে খনিজ সম্পদ, জ্বালানি তেল, লোহা ইত্যাদি সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবসা

সম্পদ উপার্জনের স্বীকৃত পন্থাগুলোর অন্যতম হচ্ছে ব্যবসা। ইরশাদ হচ্ছে, ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন’ (সূরা বাকারা, আয়াত-২৭৫)। কুরআনের সূরা জুমুআয়ও ইবাদত করার পাশাপাশি হালাল উপার্জন ও হালাল ব্যবসা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (সূরা জুমুআ, আয়াত ৯-১১)। অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরে একে-অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টি ক্রমে কোনো ব্যবসা করলে তা অবৈধ’ (সূরা নিসা, আয়াত-২৯)। উক্ত আয়াতে ব্যবসার নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে, ব্যবসা একপক্ষীয় নয়; বরং ব্যবসায় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সন্তুষ্টি ও স্বার্থ রক্ষা করতেই হবে।

শ্রম

অর্থ-সম্পদ উপার্জনের স্বীকৃত অন্যতম একটি পন্থা হল শ্রম। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন শ্রম ও শ্রমিকের কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে। কায়িক পরিশ্রম করে উপার্জন করার পবিত্র নীতি নবী-রাসূলগণের মধ্যেও ছিল। পবিত্র কুরআনে হযরত মুসা (আ.)-এর শ্রমের ঘটনা বিধৃত হয়েছে এভাবে-‘তাদের (নারীদ্বয়ের) একজন বলল, ‘হে পিতা! তুমি ইহাকে মজুর নিযুক্ত কর। কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। সে মুসাকে বলল, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। মুসা বলল, আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তি রইল। এই দুইটি মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলতেছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী’ (সূরা কাসাস, আয়াত ২৬-২৮)। উক্ত আয়াতগুলোতে শ্রমের কথা, ভালো শ্রমিকের গুণের কথা এমনকি চুক্তির মেয়াদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ভালো শ্রমিকের দুটি গুণ যেমন শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হওয়ার কথা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার মালিক পক্ষের আচরণ চাকুরে ও শ্রমিকের প্রতি কিরূপ হবে তাও উপরের আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নিয়োগকর্তার দায়িত্ব হলো তার অধীনস্থদের সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে না দেওয়া। যদি কখনও কোনো ভারি কাজ তাদেরকে দেওয়া হয় তাহলে যেন তাদেরকে সাহায্য করা হয়। আর এজন্য রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যদি তোমরা তাদের প্রতি কোনো ভারি কাজ অর্পণ কর তাহলে তাতে তাদেরকে সাহায্য করো’ (বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান : পৃষ্ঠা-০৯)।

শিল্প

অর্থ উপার্জনের অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে শিল্প। পবিত্র কুরআনে সেই শিল্পের কথাও এসেছে বিভিন্নভাবে। ইরশাদ হচ্ছে, ‘আমি নাজিল করেছি লৌহ। যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য রয়েছে বহুবিধ কল্যাণ’ (সূরা হাদীদ : আয়াত-২৫)। আল্লাহ তায়ালা লোহার খনি দিয়েছেন। তখনকার এবং এখনকার বড় বড় সকল শিল্প লোহাভিত্তিক। আদিকাল থেকেই মানুষ লোহাকে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করে আসছে। যাতায়াত, বাসস্থান, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্রসহ বহু শিল্পই লোহা ভিত্তিক। উক্ত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হল অর্থ-সম্পদ উপার্জনের সকল পন্থাই বর্ণিত হয়েছে আল-কুরআনে। আর এসবকিছুর বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে নবীজির হাদীসে।

অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে কুরআনের প্রথম কথা হল, সকল অর্থ-সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ। ইসলামী অর্থনীতির মূল কথাও তাই। সকল অর্থ-সম্পদের মূল মালিক যে মহান আল্লাহ সে বিষয়টি কুরআনে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, ‘লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ’ অর্থাৎ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর (সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৪)। উক্ত আয়াতে ‘মা’ একটি ‘আম’ ব্যাপক শব্দ। কোনো কিছুই এর বাইরে নেই। অর্থ ও অর্থের উৎস দুটোই এর মধ্যে আছে। অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, ‘জিজ্ঞেস কর, এই পৃথিবী এবং ইহাতে যারা আছে তারা কার? যদি তোমরা জান? তারা বলবে ‘আল্লাহর’! বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?’ (সূরা মুমিনুল, আয়াত ৮৪-৮৫)। আরও ইরশাদ হচ্ছে, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান কর’ (সূরা নূর, আয়াত-৩৩)। উক্ত আয়াত দ্বারাও সুস্পষ্ট, মাল ও সম্পদের কেন্দ্রীয় ও নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আবার উক্ত আয়াত দ্বারা ব্যক্তি-মালিকানাও সুস্পষ্ট প্রমাণিত। তবে ব্যক্তিমালিকানা যে শর্তযুক্ত সে ইঙ্গিতও উক্ত আয়াতেই রয়েছে। মালিক হলেও নিজে সব ভোগ করতে পারবে না। অন্যদেরও দিতে হবে। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, “এবং তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী (অভাবগ্রস্ত) ও বঞ্চিতদের হক” (সূরা জারিয়াত, আয়া-১৯)।

সকল সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ। এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বুঝে নেয়া উচিত। যেমন আমরা দেখতে পাই, সকল সম্পদের মূল উৎস তিনটি। (১) মাটি। (২) পানি। (৩) আগুন। খাদ্য, পানীয়সহ যত সম্পদ আমরা দেখতে পাব এই তিন জিনিসের বাইরে হবে না। হয়তো মাটির খনি থেকে এসেছে। যদি বলি প্লাস্টিক, তবে সেটা গাছ থেকে এসেছে আর গাছ মাটি থেকে এসেছে। ওই গাছ বড় হতে পানি লেগেছে। কারখানায় তৈরি হয়ে আসতে আগুন লেগেছে। আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে, এসবের কোনোটি কি মানুষ তৈরি করতে পেরেছে? না, কখনও না। মানুষ যতই বাহাদুরি করুক, হাঁক-ডাক দিক, চাঁদ অতিক্রম করে মঙ্গলগ্রহে চলে যাক কিন্তু তার দৌড় আল্লাহর দেওয়া মাটি, পানি ও আগুন পর্যন্তই। ইরশাদ হচ্ছে, ‘তোমরা যা বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কী? তোমরা কি তা উৎপন্ন কর, না আমি তা ফলাই?’ (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত ৬৩-৬৪)। আল্লাহপাক আরও ইরশাদ করেন, ‘তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরা কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি?’ (সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৬৮-৬৯)।

আমরা সবাই জানি শিল্পোন্নয়নের এ যুগেও কল-কারখানাগুলোর অন্যতম উপাদান পানি। আল্লাহপাক চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছেন-তোমাদের সম্পদের মূল উৎস মাটি আমার দেওয়া, মাটির উর্বরতা আমার দেওয়া, বসবাসের উপযোগিতা আমার দেওয়া। এরপর পানিও আমি নাজিল করি। তোমরা কি পানি নাজিল করতে পার? না, কখনও না। এরপর আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, ‘তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে

চিন্তা করেছ কী? তোমরা কি ইহার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?’ (সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৭১-৭২)। তাহলে আগুনও আল্লাহর দেওয়া।

মোটকথা অর্থ-সম্পদের মৌলিক যে উৎসগুলো, যেগুলো থেকে সম্পদ আহরিত হয় তার কোনটিই মানুষ তৈরি করতে পারেনি, পারবে না। মানুষ এগুলোকে কেন্দ্র করেই বড় বড় শিল্প তৈরি করেছে। মানুষ এখন চাঁদে যাচ্ছে, মহাশূন্যে যাচ্ছে, মঙ্গলগ্রহে বসবাসের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু যেটাতে করে যাচ্ছে সেটা আল্লাহর দেওয়া সম্পদ লোহা থেকে তৈরি। ইরশাদ হচ্ছে, ‘আমি নাজিল করেছি লৌহ। যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ’ (সূরা হাদীদ, আয়াত-২৫)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সকল তাফসীরবিদগণ যানবাহন, বিমান সামগ্রী, কলকারখানা, অস্ত্র-শস্ত্রের কথাই বলেছেন। কারণ এসবই এর আওতায় আসবে। এসবগুলোতেই মানুষের কল্যাণ এবং প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে। সকল সম্পদের মূল মালিক যেহেতু আল্লাহ সুতরাং আল্লাহ যাকে মালিকানা দিয়েছেন সে নিরংকুশ মালিকানার অধিকারী নয়; বরং তার মালিকানা শর্তযুক্ত মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রিত মালিকানা। সুতরাং আল্লাহ সম্পদ সম্পর্কে যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলো তাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কিছু করতে হবে এমন শর্ত, কিছু ছাড়তে হবে এমন শর্ত। ব্যক্তির শর্তযুক্ত মালিকানা কুরআন স্বীকার করেছে। যেমন নিজের বাড়ি-ঘর সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঘরে ঘরবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না’ (সূরা নূর, আয়াত-২৭)। ঘরের মালিকানা যারটা তার। যার যার ঘরের মালিকানা তার তার। এজন্যই তো অনুমতি নিতে হবে। অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করে দেই-এর মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা হতে তোমরা ব্যয় কর’ (সূরা বাকারা, আয়াত-২৬৭)। অর্থাৎ যেটা তোমরা কামাই করেছ সেটার মালিকানা তোমাদের নিজেদের। আরও ইরশাদ হচ্ছে, ‘ইয়াতীমদের তাদের সম্পদ দিয়ে দাও’ (সূরা নিসা, আয়াত-২)। এখানেও ব্যক্তিমালিকানা প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে ব্যক্তিমালিকানার প্রমাণে বহু আয়াত রয়েছে।

কুরআন সম্পদ ভোগ করার ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে। মানুষ সম্পদ ভোগ করতে পারবে তবে সেটা হতে হবে হালাল সম্পদ। সম্পদ উপার্জন ও ভোগ করার ক্ষেত্রে কুরআন হালাল হওয়ার শর্ত আরোপ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে, ‘হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর’ (সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৮)। হালালের উক্ত বিধানটি সর্বজনীন। মুসলমান হলেই তাকে হালাল খেতে হবে। এজন্য নবী ও রাসূলগণকেও একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, ‘হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর’ (সূরা মুমিনুন, আয়াত ৫১)। এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘আল্লাহপাক মুমিনদের সে নির্দেশই দিয়েছেন যা তিনি তাঁর রাসূলগণকে দিয়েছেন’ (মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড : পৃষ্ঠা-৩২৬)। হালালের বিপরীত হারাম। যা মুমিনের জন্য

নিষিদ্ধ। এ ধরনের অনেক হারামের কথা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, ‘হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতীমার বেদী ও জুয়ার তীর এসবই অপবিত্র, শয়তানি কাজ। সুতরাং এসব পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর’ (সূরা মায়িদা, আয়াত-৯০)। অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, ‘তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেই পশু যা আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা হয়েছে...’ (সূরা মায়িদা, আয়াত-৩)।

সম্পদ অর্জনের নিষিদ্ধ পন্থা

সম্পদ অর্জনে একটি মৌলিক নিষেধাজ্ঞার কথা পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে এভাবে-‘তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার জন্য তা (এ সম্পর্কে মামলা) বিচারকের নিকট পেশ করো না’ (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৮)।

পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় বিপদগুলোর অন্যতম হল, সম্পদ এখানে এককেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনাঢ্যদের হাতে চলে যায়। জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংস্থার জরিপে বার বার এসেছে যে, শুধু ১% লোক ভোগ করে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি সম্পদ। পক্ষান্তরে আল-কুরআনের অর্থনৈতিক বিধানগুলো এমনভাবে সাজানো, যাতে এত বৈষম্য সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই। আল-কুরআনের অর্থব্যবস্থা সর্বজনীন। ইরশাদ হচ্ছে, ‘যাতে করে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে’ (সূরা হাশর, আয়াত-৭)। কেউ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলবে আর কেউ অনাহারে দিনাতিপাত করবে-আল-কুরআনের অর্থব্যবস্থায় এমন সুযোগ নেই। পুঁজিবাদের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সুদ। ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বাড়ার পেছনে-যেসব উপাদান দায়ী সুদ তার অন্যতম। আল-কুরআনে সুদকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকলে সুদের যে অংশই (০.০০১ ভাগ বা তার চেয়ে কম হলেও হারাম)। অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও। যদি তা না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও’ (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৮-২৭৯)। ধনী-গরীবের মধ্যে যখন বৈষম্য সৃষ্টি হয় তখন সমাজের অবস্থা কী দাঁড়ায়-সে সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে, ‘সে যখন প্রশ্ন করে তখন জমিনে অশান্তি সৃষ্টি এবং ফসল ও (জীব-জন্তুর) বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না’ (সূরা বাকারা : আয়াত-২০৫)।

হারাম পেশার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা বা করানো যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে, ‘তোমাদের দাসীগণকে সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না’ (সূরা নূর, আয়াত-৩৩)। বর্তমানে নানাভাবে যৌনচর্চা করা হচ্ছে। যৌনকর্মীদের নিয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে। যৌনকর্মীদের

ভদ্রনাম দেওয়া হচ্ছে। পতিতালয়ের জায়গায় যৌনপল্লী, পতিতা হয়ে গেলে যৌনকর্মী-সেক্স ওয়ার্কার। নাম যাই হোক, এরূপ কাজ ও এর দ্বারা অর্থ উপার্জন করা জঘন্য অপরাধ।

কখনও অপচয় করা যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে, ‘এবং আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপব্যয় করবে না। আল্লাহ অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না’ (সূরা আরাফ, আয়াত-৩১)। অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, ‘যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়’ (সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৭)। বর্তমান সময়ে নামিদামি হোটেল-রেস্তোরাগুলোতে বড় বড় অনুষ্ঠান ও পার্টিগুলোতে যে পরিমাণ খাবার ধনীর দুলালেরা অপচয় করে ফেলে তা দ্বারা কি হাজার হাজার দরিদ্র শিশুর মুখে দুবেলা অন্ন দেওয়া যেত না? শেষোক্ত আয়াতটিতে অপচয়ের সাথে সাথে কার্পণ্য না করার কথাও বলা হয়েছে। অহেতুক কার্পণ্যও ইসলাম সমর্থন করে না। অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, ‘এবং কেহ কার্পণ্য করলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ’ (সূরা লাইল, আয়াত আয়াত ৮-১০)। সম্পদ আছে বলেই যেখানে-সেখানে তা ব্যয় করা যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে, ‘মানুষের মধ্যে এক-শ্রেণির লোক আছে যারা ‘লাহওয়াল হাদীস’ বা অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে থাকে’। উক্ত আয়াতে ‘লাহওয়াল হাদীস’ দ্বারা গান-বাজনা, খেল-তামাশা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

ধনী ব্যক্তিদেরকে তাদের সম্পদের হক তথা যাকাত-উশর ইত্যাদি আদায় করতে বলা হলে এবং ‘এ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ’-বলা হলে তাদের কেউ কেউ জবাব দেয়, এসব তো আমার পরিশ্রম ও মেধার ফসল। এ ধরনের জবাব কিন্তু নতুন নয়। কারুনের সাথে মুসা (আ.)-এর যে কথোপকথন হয়েছে তাতেও আল-কুরআনের অর্থনীতির অনেক বিষয় আছে। ইরশাদ হচ্ছে, ‘কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দস্ত করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাস্তিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা দ্বারা আখেরাতের আবাস লাভের চেষ্টা কর এবং দুনিয়া থেকেও তোমার অংশ ভুলে যেও না এবং আল্লাহ যেমন তোমার উপর অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও অন্যের প্রতি অনুগ্রহ কর এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না। সে বলল, এসব তো আমি আমার জ্ঞানবলে লাভ করেছি’ (সূরা কাসাস, আয়াত ৭৬-৭৮)। আল্লাহর রাস্তায় দান করার পাশাপাশি নিজের খরচাদির জন্য সম্পদের একটি অংশ রাখার কথাও উক্ত আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। সম্পদের উপর বাধ্যতামূলক অন্যদের যে অধিকার রয়েছে তার একটি হল উশর। ইরশাদ হচ্ছে, ‘এবং যখন ফসল কাটার দিন আসবে তখন তার হক আদায় করবে’ (সূরা আনআ’ম, আয়াত-১৪১)। অর্থাৎ যা খাদ্য-শস্য হবে তার এক দশমাংশ

(সেচে হলে ৫%) গরীবদের জন্য দিতে হবে। জমির মালিকের জন্য এটা দরিদ্রের প্রতি কোনো করুণা নয়। ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম যাকাত। আল-কুরআনের যেখানেই নামাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানেই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নামাজ মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং যাকাত মানুষকে দারিদ্রমুক্ত করে। যাকাত ব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের সর্বোত্তম হাতিয়ার। একটি সমাজে সুষ্ঠুভাবে যাকাত বণ্টন করা হলে সেই সমাজে কখনও দারিদ্র্য থাকতে পারে না। এজন্য আল-কুরআনে যাকাত আদায়ের জন্য বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

সকল সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ। সেই সম্পদের মধ্যে যা কিছু মালিকানা মানুষকে দেওয়া হয়েছে তা হল শর্তযুক্ত মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রিত মালিকানা। সুতরাং অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতে হবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এবং ব্যয় করতে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী-এটাই আল-কুরআনের অর্থনীতির মূলকথা। আল-কুরআনের অর্থ ব্যবস্থা সর্বজনীন। আল-কুরআনের অর্থব্যবস্থার পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে সমাজ-রাষ্ট্রে কেউ দারিদ্র্য থাকতে পারে না।

প্রত্যেক মুসলিমকে ইসলামের অনুশাসন মেনে অর্থনৈতিক কারবার করার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেছে। বৃহত্তর, মাঝারি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ব্যবসার ক্ষেত্রেও মানুষকে সর্বদা ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতির উপর পরিচালিত হতে হবে। এমনকি একজন ব্যক্তি বিশেষও ইসলামের বিধানাবলী মেনেই তার আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করবে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমকে এক্ষেত্রে ইসলামের দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। সাধারণ মূলনীতিগুলো হল যথাক্রমে- হালাল মালের ব্যবসা করা, যাবতীয় সূদী লেনদেন থেকে বিরত থাকা, ঘুষ ও প্রতারণার আশ্রয় না নেয়া এবং মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোন মাল মওজুদ না রাখা ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআনের বাস্তবায়ন

রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলেও ইসলামের সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যিক। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্ব পালনের কার্যাবলী তিন ভাগে বিভক্ত। যথা: আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ।

আইন বিভাগ

মানবজীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিবিধ আইন অত্যাৱশ্যক। ইসলামে আইনদাতা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, - -

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

“হুকুম বা বিধান একমাত্র আল্লাহরই।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০)

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَائِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“তারা কি জাহিলিয়াতের আইন চায়? বিশ্বাসীগণের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর কে হতে পারে?” (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৫০)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ ‘আল্লাহই হলেন আইনদাতা, আর তাঁর নিকট থেকেই আইন নিতে হবে’। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫৫; নাসাঈ, হাদীস ৮/২২৬) আর সে আইন কেবল আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যেই মওজুদ রয়েছে। তাই আইনসভার দায়িত্ব হল আল-কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক অনুমোদিত আইনই কেবল পাশ করা এবং মানব রচিত কোন আইন পাশ না করা।

নির্বাহী বিভাগ

আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশিত আইন মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ও ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়ন করা নির্বাহী বিভাগের কাজ। এক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বশীলবৃন্দ যেমন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সচিব, টিএনও, ডিসি, এসপি ইত্যাদি সকলকে যেমন জনগণের সেবক হতে হবে, তেমনি আল্লাহর আইন জারি ও যথাযথভাবে কার্যকরকরণে কোনরূপ অনীহা, উপেক্ষা, দুর্বলতা ও স্বজনপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না।

এজন্য প্রশাসন বিভাগকে অত্যন্ত শক্তিশালী, সাহসী ও দৃঢ় হতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

‘নিশ্চয় আমরা আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায্য-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়েছি, যাতে রয়েছে প্রচুর শক্তি ও রয়েছে

মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; এটা এই জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী’ (সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত ২৫)। উক্ত আয়াতে ‘আল-হাদীদ’ বা লৌহ বলে প্রশাসনিক শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এমনকি কোনপ্রকার নমনীয়তা, দুর্বলতা কিংবা দয়া-সহানুভূতি প্রদর্শন করাও যাবে না (সূরাহ আন-নূর, আয়াত ২)। আল্লাহর আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কর্মদক্ষতার মূর্ত প্রতীক। এক্ষেত্রে তিনি যেমন কোনরূপ দুর্বলতা দেখাননি, তেমনি কোনরূপ সুপারিশ গ্রহণ করাকেও বরদাশত করেননি। ২৬

রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সর্বত্র আমার বিল মা‘রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব নির্বাহী বিভাগ ও প্রশাসনিক বিভাগই পালন করবে। অনুরূপভাবে এ বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি দেশের আইনশৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন এবং আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। মানুষের উপর প্রভুত্ব কয়েম করবেন না। মানুষের উপর কোন রকম যুলুম বা অত্যাচার করবেন না। নিজের মনগড়া বিধান জনগণের উপর চাপিয়ে দিবেন না। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কাউকে ব্যবহারও করবেন না। বরং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তাকে সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ‘সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই’। ২৭ এক্ষেত্রে আল্লাহভীতি যন্ত্রণী ভূমিকা পালন করবে। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

‘ইমাম বা শাসক ঢালস্বরূপ। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং শত্রুর ক্ষতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে যদি তাকওয়া ও ন্যায়-বিচারের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে, তবে তার জন্য সে পুরস্কৃত হবে। আর যদি ন্যায় ব্যতীত অন্য কিছু আদেশ করে তবে সে পাপের জন্য দায়ী হবে’।

এজন্যই তো তাদের মর্যাদাও অনেক বেশি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেয়া, সমস্ত দুনিয়া ও তার উপরের যাবতীয় সম্পদ হতে উত্তম’। এজন্য প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে ধার্মিক, জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও নেতৃত্বদানে দক্ষ ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত।

বিচার বিভাগ

ইসলামী রাষ্ট্রের আইনের প্রধান উৎস হবে কোরআন এবং কোরআনের আলোকেই পরিচালিত হবে মুসলিম সমাজের বিচারব্যবস্থা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করো এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক কোরো না।’ (সূরা নিসা, আয়াত ১০৫)

স্বাধীন বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের শান্তি ও স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত। এজন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশিদুনের যুগে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। মূলত সে যুগগুলোতে প্রয়োগকৃত বিচারব্যবস্থাই হল ইসলামী বিচার ব্যবস্থা। ইসলামী বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য দু’টি। যথা : (ক) রায় প্রদানের ক্ষেত্রে আল-কুরআন ও সুন্নাহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলা এবং (খ) একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রণয়ন করা, যার সাহায্যে রাষ্ট্রের নতুন ও বিচিত্র পরিস্থিতিতে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগ সম্ভব হয়।^{২৬}

আর বিচার ব্যবস্থায় আইনের উৎস ৪টি। যথা : (ক) পবিত্র কুরআন (খ) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহ, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বিচারের রায়গুলোও অন্তর্ভুক্ত। (গ) ইজমা‘ তথা ছাহাবীগের ঐকমত্য এবং (ঘ) ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত গবেষণালব্ধ মতামত ও সিদ্ধান্ত। আর তা তখনই নেয়া হয় যখন একজন বিচারক কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা‘ থেকে কোন বিষয়ে রায় প্রদানের আইন খুঁজে না পান।^{২৭}

অতএব এ বিভাগের সাথে যারা জড়িত থাকবেন তারা বিচার বিভাগের উক্ত বৈশিষ্ট্য ও আইনের উৎসগুলোর ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। মামলার দীর্ঘসূত্রিতা উৎখাত করে যতসম্ভব দ্রুত ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। হয়রানী, প্রতারণা করবেন না। এ প্রসঙ্গে ইসলামের মূলনীতি সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক’ (সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৪-৪৫ ও ৪৭)। ইসলামে বিচারকের অবস্থা বর্ণনায় নিচের হাদীছটি যথেষ্ট। বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

‘বিচারক তিন প্রকার। এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতী, আর দুই শ্রেণীর বিচারক জাহান্নামী। (১) যে বিচারক সত্য উপলব্ধি করে এবং তদনুযায়ী বিচার করে, সে জান্নাতী (২) যে বিচারক সত্য উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তদনুযায়ী বিচার করে না, সে জাহান্নামী। (৩) আর এক শ্রেণীর বিচারক সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করে, সেও জাহান্নামী’। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীছ নং-৩৫৭৩, অধ্যায়-১৮ বিচার ব্যবস্থা, অনুচ্ছেদ-২ বিচারক ভুল করলে, পৃ. ৬৪১) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, ‘যে ব্যক্তিকে আল্লাহ

তা‘আলা প্রজা সাধারণের উপর দায়িত্বশীল করেন অথচ সে যখন মারা যায়, তখনও সে প্রজা সাধারণগণের প্রতি প্রতারণাকারী থাকে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দেন’। (মুসলিম, হাদীছ ১৪২) এগুলো ছাড়াও শিষ্টাচার ও শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইসলামের দিক-নির্দেশনাগুলো সম্পর্কে যথাযথ ধারণা অর্জন করা যরুরী।

মানব রচিত আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী

শরী‘আত বিরোধী মানব রচিত মনগড়া আইনের ভিত্তিতে পরিবার, সমাজ ও দেশ পরিচালনা করা শরী‘আতের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কেননা আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হল আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সংবিধান। এটা ব্যতীত কোন কিছুই চূড়ান্ত হতে পারে না। কেননা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও যেহেতু আল্লাহকে একক গণ্য করতে হবে, সেহেতু কোন ব্যক্তি শরী‘আত বিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার অধিকার রাখে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

‘আল্লাহ তা‘আলা যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা কাফের’ (সূরা আল-মায়দাহ, আয়াত ৪৪)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

‘আল্লাহ তা‘আলা যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা যালেম’ (সূরা আল-মায়দাহ, আয়াত ৪৫)।

এবং অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

‘আল্লাহ তা‘আলা যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা ফাসেক’ (সূরা আল-মায়দাহ, আয়াত ৪৭)।

অতএব শরী‘আত বিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আল্লাহর অধিকার ভুলুপ্ত হয়। তাছাড়া এটা আল্লাহকে অপমান করার শামিল। যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আল-কুরআনের পূর্ণঙ্গ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সার্বিক জীবনে আল-কুরআন তথা ইসলামকে পূর্ণঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে বাস্তবে রূপদান করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

উপসংহার

এই থিসিসের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কুরআন শুধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং মানবজীবনের সব সমস্যা ও সংকটের সমাধান রয়েছে এতে। কুরআনকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করলে মানবজাতি একটি উন্নত, শান্তিপূর্ণ ও সফল জীবন গড়তে পারে। এজন্য নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত এর পাশাপাশি এর অর্থ অনুধাবন এবং তদানুযায়ী এর শিক্ষা ও নির্দেশনাকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কার্যকর ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে।

তথ্যসূত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কোরআনের আয়াতের অর্থ এবং সিহাসিত্তার হাদিসের রেফারেন্স সরাসরি মূল টেক্সটেই দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য রেফারেন্সগুলো নিম্নের উল্লেখ করা হলো:

- ১ তাফসিরে তাবারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭
- ২ বাহরুল উলুম, আবুল লাইস সামারকান্দী, খণ্ড: ১, পৃ.: ৭১
- ৩ আকিদাতুত তাহাবি: ৫
- ৪ মিশকাত হা/৫৮৪১; ফাৎহুল বারী ১/২৩, হা/৩
- ৫ সৈয়ুত্বী, আল-ইৎকান ১/৩৫ পৃষ্ঠা
- ৬ সুনানে দারেমি, হাদিস ৩৪১৩
- ৭ সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী ১/৩৯২
- ৮ আততিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন, অধ্যায় ৫, পৃ. ৫৪
- ৯ মাদারিজুস সালিকীন, ইবনুল কায়্যিম ১/৪৫২
- ১০ মাদারিজুস সালিকীন ১/৪৫৩
- ১১ হিলইয়াতুল আউলিয়া ১০/৩২৬
- ১২ আযযুহুদ, আহমাদ, বর্ণনা ১৮৬১
- ১৩ আযযুহুদ, আহমাদ, পৃ. ১৬৮, বর্ণনা ৬৮০
- ১৪ মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, মারওয়াযী, পৃ. ১৪৮
- ১৫ তাযকিরায়ে মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রাহ., সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ., পৃ. ৫৬
- ১৬ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান, সূরা নাহল ৮৯ আয়াতের ব্যাখ্যা
- ১৭ ইমাম ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম (দারুত ত্বাইয়েবা, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), ৪র্থ খ-, পৃ. ৫৯৪
- ১৮ তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম, ৪র্থ খ-, পৃ. ৫৯৪-৫৯৫
- ১৯ আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা‘দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৪৪৬
- ২০ উসুলুল ইমান’, ড. আহমদ আলী, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা ৪৩

- ২১ আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃঃ ১০৬
- ২২ মুসনাদ আহমদ: ১৬৬১; সহীহ ইবন হিব্বান ৪১৬৩
- ২৩ মুসনাদে বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস: ৭৬৩৮
- ২৪ উমদাতুল ক্বারী ১৩/২৩৫
- ২৫ বাইহাকি ৮১৪৫
- ২৬ ড. মুহাম্মাদ আয-যুহাইলী, তারীখুল কাযা ফিল ইসলাম (বৈরুত: দারুল ফিকরিল মু'আসির, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৮৪।
- ২৭ ড. 'আলী মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবী, আল-খালীফাতুল আওয়াল আবু বাকর আস-সিন্দীক শাখসিয়াতুহু ওয়া 'আসরুহু (বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ, ৭ম সংস্করণ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৪২।

-----সমাপ্ত-----